Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

"...বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত ১
দেশে বিদেশে ২
অনলাইন গিগ-অর্থনীতি... ৩
বালিগঞ্জ বিধানসভা ভোটে অপপ্রচার ৪
আর এক ইঞ্চিও নয় ৫
চেন্নাই-এ আর এস পি'র কর্মীসভা ৬
আইসিডিএস কর্মীদের অধিকারের স্বীকৃতি ৭
রাশিয়া-ইউক্রেন (পশ্চিমী উস্কানি) ৮

68th Year 50th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 30th April & 7th May 2022 [Joint Issue]

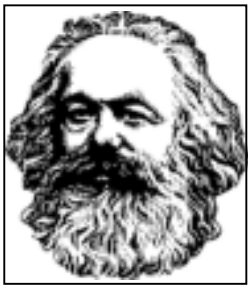

২০৫তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ

১৬২তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ

ভারতবর্ষের যে সব ইতিহাস আমরা পড়ি সে তার বাইরের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে বিদেশীর অংশই বেশী। তারা রাজ্যশাসন করেছে, যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, আমরা সেই বাইরের চাপ স্বীকার করে নিয়েছি, —মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দিয়ে সেটা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছি, মাঝে মাঝে চেষ্টা সফল হয়েছে। মোটের উপর এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অকৃতার্থতাই অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে আমাদের চোখে পড়তে থাকে।

এ কথা মানতে হবে যে রাষ্ট্রিক সাধনা ভারতের সাধনা নয়। একদা বড়ো বড়ো রাজা ও সম্রাট আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মহিমা তাঁদের মধ্যেই স্বতন্ত্র। দেশের সর্বসাধারণ সেই মহিমাকে সৃষ্টি, বহন বা ভোগ করে না। ব্যক্তিবিশেষের শক্তির মধ্যেই তার উদ্ভব এবং বিলয়।

কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণির লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।

সূত্র : ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থের ভূমিকা।

মোদি জমানায়

দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত

আরও ঐক্যবদ্ধ ও তীব্রতর গণআন্দোলনই একমাত্র সমাধান

স্বাধীনোত্তর ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন বহুবিধ সমস্যায় দীর্ণ ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। বস্তুত, স্বাধীন এই সুবিশাল ভূখণ্ডে যে আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের কর্মসূচি দেশের সরকার ধারাবাহিকভাবে এককালে অনুসরণ করেছে তার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা। উপার্জনগত বৈষম্য ছিল। অঞ্চলভেদে সেই বৈষম্য যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। সকল শ্রেণির মানুষের জীবনে সমভাবে উন্নয়ন ঘটানো কেন্দ্রীয় সরকারগুলির উদ্দেশ্য ছিল না।

নানা চমকপ্রদ বাক্যবন্ধ ব্যবহৃত হলেও আদপে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বিশেষ এক শ্রেণির স্বার্থ পূরণেই পরিকল্পিত হয়ে চলেছিল। কর্মহীনতার দুর্মর সমস্যা ছিল। বহু সংখ্যক শিক্ষিত মানুষও সুস্থ জীবন নির্বাহ করতে গলদঘর্ম হতেন। কলকারখানা যেগুলো গড়ে উঠছিল, সেখানে ছাঁটাই, লে অফ, লক আউটের গভীর সমস্যা ছিল। সমানভাবে কিংবা মাঝে মধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেত। শিক্ষার হারবৃদ্ধি হচ্ছিল শ্লথগতিতে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়- গুলিতে অনেক সময় শিক্ষার সঠিক বা সম্যক পরিবেশও ধ্বস্ত হয়েছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি ছিল। দেশের কোনো কোনো প্রান্তে মাঝে মধ্যেই দিগন্তবিস্তৃত দাঙ্গা হাঙ্গামাও ছিল। পুলিশ বা আইন রক্ষকদের ভূমিকা সব দিক থেকে নিরপেক্ষ এবং প্রশ্নের উর্ধে ছিল, এমন দাবি কোনভাবেই সঙ্গত ছিল না। একপেশে বিকাশ চলেছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকারি প্রশ্রয়ে। কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত সরকারের নীতিগত অবস্থানের জন্যই এতসব ছিলনার বাড়বাড়ন্ত ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে অযাচিত সংঘাত ছিল। একাধিকবার বহু প্রাণক্ষয়ী যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল। এমন কি, অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিনের সঙ্গেও ১৯৬২ সালে রক্তক্ষয়ী সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। আর যখনই যুদ্ধের বাস্তবতা দেশকে গ্রাস করেছে তখনই, যুদ্ধকালীন এমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক দাবিগুলি অস্বীকৃত হয়েছে। গণআন্দোলন সংগঠিত করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অগণিত প্রতিবাদী মানুষকে চক্রান্তমূলকভাবে কারান্তরালে রাখা হয়েছে। DIR, MISA ইত্যাদির ব্যবহারে মানুষের ন্যায্য আন্দোলন স্তব্ধ করার অপচেষ্টাও হয়েছে।

এতসব বিরূপ অভিজ্ঞতা ভারত রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হলেও যা হয়নি তা হলো, ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে দেশের সমস্ত মানুষকে বিভাজিত করা হয়নি। রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বিগত আট বছর যাবৎ বিশেষ করে, ২০১৯ এ মোদির দলের জয়ের পরে এ দেশের মানুষদের আর মানুষ হিসেবে বিবেচনা করাই হচ্ছে না। তারা মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন বা হিন্দু হিসেবেই দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের ব্যাপক প্রসার চলেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দুদের ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। ঘৃণার বাতাবরণ পরিকল্পিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। দেশের নাগরিকত্ব ঠিক করা হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ভীতি সঞ্চার করে নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের ঐক্য ও সংহতি বিপর্যস্ত করার আয়োজন পূর্ণতা পাচ্ছে।

ভারতের সংবিধানে যে সব প্রগতিশীল ধারাগুলো রয়েছে তা, গায়ের জোরে বিকৃত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রবাদ দেশপ্রেমের ধারণাকেই পাল্টে ফেলছে। সরকারের যে কোনো সমালোচনাকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধবাদী ভাবনা হিসেবে সর্বত্র প্রচার চলছে। শ্রমিক শ্রেণির ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারকে আইন করে অস্বীকার করা হচ্ছে। সংসদে সংখ্যার তাণ্ডবে যা খুশি তাই পাস করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইদানিংকারে সুপ্রিম কোর্টও মন্তব্য করেছে যে, অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করেই আইন প্রণয়ন হচ্ছে!

৩৭০ ধারা বা ৩৫(ক) জোর করে বাতিল করার মাধ্যমে শুধু কাশ্মীরের মানুষদেরই গণতান্ত্রিক অধিকার বরবাদ করে এক নিষ্ঠুর পুলিশ নির্মিত হয়নি। দেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেও অকাতরে গণতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে চলেছে। অসম রাজ্যের বিজেপি সরকার ও উত্তরপ্রদেশের অনুকরণে বিনা বিচারে হত্যা করে চলেছে। নাম দিচ্ছে 'এনকাউন্টার'!

এ দেশে কোনকালেই সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যা করার নিদান দেওয়া হয় নি। এখন তো শুধু হত্যাই নয়, প্রকাশ্যেই মুসলমান নারীদের ধর্ষণ করার আহ্বানও জানানো হচ্ছে। সমস্ত জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া, যুক্তিহীনভাবে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস এমনকি, কেরোসিন তেলের দাম আকাশচুম্বী। সাধারণ মানুষের সসম্মান জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছে আর গণবিক্ষোভের সম্ভাবনাও বন্ধ করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। বহু শিক্ষিত মানুষও এই কুৎসিত বোধের শিকারে অবনমিত। এমন দুঃসহ পরিস্থিতি কখনোই ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির অঢেল সুবিধা করে দেবার জন্য ভারতের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ চলছে নির্বিচারে। দেশের পুঁজিপতিদের বিশেষ সুসময়। তাদের লুণ্ঠন জারি রাখতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেলাগাম উৎসাহী। আগামী অল্পকালেই ভারতের অর্থনৈতিক সংকট অতলস্পর্শী হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এমন এক বিসদৃশ অবস্থা থেকে বাঁচতে ও দেশকে বাঁচাতে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও সোচ্চার হতেই হবে। আরও সংহত করতে হবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ। আর কোনো পথ নেই।

ফ্রান্সে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ পুনর্নির্বাচিত হলেন

এতাবৎকাল ফরাসি ভোটাররা পরিবর্তনেরই পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সদ্য অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই পরম্পরা ভেঙ্গে ফরাসি ভোটাররা ইমানুয়েল মাকরঁকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ফের নির্বাচিত করলেন। ফ্রান্সে পর পর দু'বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়াটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ খবর। মাকরঁ প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণপন্থী মারিল ল্য পেনকে বেশ বড় ব্যবধানেই পরাজিত করেছেন। জনমত সমীক্ষায় মাকরঁ এগিয়ে থাকলেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথাই বলা হয়েছিল। জার্মানীর চ্যান্সেলর পদে এঞ্জেলা মার্কেলের বিদায়ের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনা চলছিল। মার্কেলের পর ইমানুয়েল মাকরঁ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হতে এখন আর কোন অসুবিধা রইল না। অতি দক্ষিণপন্থার তাণ্ডব থেকে হয়তো ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাময়িক কালের জন্য রক্ষা পেল। ইউরোপের স্থিতাবস্থার স্বার্থে আশা করা যায় মাকরঁ সাফল্য অর্জন করবেন।

আমেরিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মৈত্রীর ক্ষেত্র এবার মহাকাশেও প্রসারিত হল

আমেরিকা এবং সংযুক্ত আরব আমির শাহীর মৈত্রী দীর্ঘদিনের। মঙ্গল গবেষণায় দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রথম যান পাঠিয়েছিল আমিরশাহী। এবার সেই সংক্রান্ত তথ্য লেনদেন এবং বিশ্লেষণে আমেরিকা এবং আমিরশাহী একত্রে কাজ করবে। আপাতত স্থির হয়েছে দুপক্ষ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চরিত্র নিয়ে গবেষণা করবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে 'মাভেন' নামে আমেরিকার একটি উপগ্রহ মঙ্গলের কক্ষপথে ঢুকেছিল। আমিরশাহীর গবেষণা সংস্থা থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল, 'নাসা' 'মাভেন' থেকে সংগৃহীত তথ্য আমিরশাহীকে দেবে, আর আমিরশাহীর প্রেরিত মঙ্গলযানের তথ্য 'মাভেন'কে দেওয়া হবে। 'নাসার' সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করার উপরে বিশেষ জোর দিয়ে—আমিরশাহীর মহাকাশ অভিযানের কর্তা বলেছেন, এই যৌথ উদ্যোগ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হবে। দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট দুই দেশের বিজ্ঞানীমহল।

শিক্ষায় গৈরিকীকরণের লক্ষ্যে

শিক্ষায় গৈরিকীকরণ স্থায়ী ব্যবস্থা হতে চলেছে এবং সেই সঙ্গে সহিষ্ণুতার পাঠও উধাও হতে চলেছে সিবিএসই-র পাঠ্যক্রমে। সিবিএসই-র পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়ল উর্দু কবি ফৈজ আহমেদ ফৈজের দুটি কবিতা। দশম শ্রেণিতে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনীতি এই অধ্যায়ে ফৈজের কবিতা দুটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে পড়ানো হত। দশম শ্রেণিতে বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি। বাদ পড়েছে 'Democracy and Diversity' নামের অধ্যায়টিও। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে পড়ুয়াদের সচেতন করার জন্য এই অধ্যায়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের সাফ জবাব NCERT-র নির্দেশ মেনেই পাঠ্যক্রমে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুধু দশম শ্রেণিতেই নয়, একাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রমেও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, ইতিহাসের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়েছে 'Central Islamic Lands' অধ্যায়টি। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে কীভাবে ইসলামিয় শাসন কায়েম হয়েছিল, তার কথাই বলা হয়েছিল এই অধ্যায়ে। বেশ কিছু আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গও বাদ পড়েছে। দশম ও একাদশ শ্রেণি ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাস থেকে বাদ গিয়েছে "Cold war and non-aligned movement" যে অধ্যায়টিতে মূলত দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহেরুর শাসনকাল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

গৈরিকীকরণের চেষ্টায় ভারত তথা উপমহাদেশের ইতিহাস নতুন করে লেখার উদ্দেশ্যে এই সব পরিবর্তন আনছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা NCERT। শিক্ষাবিদদের একাংশের অভিযোগ মোদী সরকার যেমন বিশ্ব ইতিহাসে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কে জানতে দিতে চায় না নতুন প্রজন্মকে, তেমনই কমিউনিজম তথা সামাজ বিপ্লবের ধারণাকেও পাঠ্যক্রমের বাইরেই রাখতে চায়। ভাবা যায়, CBSE র পাঠ্যক্রম থেকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানবে না বর্তমান প্রজন্মের পড়ুয়ারা, তারা বাবর, আকবর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে কিছু জানবে না, দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম থেকে "Mughal Court" -এর অধ্যায়টিও বাদ পড়েছে, যে অধ্যায়টি ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাহলে বাকী রইল কী, এই প্রশ্নটাই শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে।

জীবন বীমা করেপোরেশনকেও কী বেচে দেওয়া হবে?

দাঙ্গার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয় সুযোগ বুঝে কোনো না কোনো এক অনর্থ ঘটায়। CNBC চ্যানেলে একটা আপাত ছোট খবর হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অন্য কোনও চ্যানেলেও খবরটি এই প্রকার :—

২৮.২.২২—L.I.C-র মোট বাজার দর (valuation) দেখানো হয়েছিল ১৬ লক্ষ কোটি টাকা।

১৩.৪.২২—L.I.C-র মোট বাজার দর (valuation) দেখানো হয়েছে ১১ লক্ষ কোটি টাকা।

২১.৪.২২—L.I.C-র মোট বাজার দর (valuation) দেখানো হয়েছে ৬ লক্ষ কোটি টাকা।

মাত্র ২ মাসের মধ্যে L.I.C -র বাজারদর কি করে ১০ লক্ষ কোটি টাকা কমে গিয়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়ায় বোঝা যাচ্ছে না।

জনগণকে বুলডোজারের সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন রেখে L.I.C. র বাজার দর (Market value) কমিয়ে দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কয়েকদিন পর L.I.C র বাজার দর ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ কোটিতেও নামিয়ে দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার।

তারপর??? সুযোগ বুঝে আম্বানিবাবু বা আদানি দাদা টুক করে ২৬ লক্ষ কোটি টাকার কোম্পানি ১/২ কোটি টাকায় কিনে নেবে।

তাহলে তো ৯৯.৯ শতাংশ সম্ভাবনা L.I.C ও বিক্রী হয়ে যাবে এবং এক ঝটকায় দেশের কোটি কোটি মানুষ পথে বসবে।

কিসের এত তাড়া?

দিল্লীর জাহাঙ্গীরপুরীতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার সিদ্ধান্তে শীর্ষ আদালতের স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরও বিজেপি পরিচালিত পুরসভার দিল্লীর মোট ১৭৩১টি বেআইনি কলোনির মধ্যে কেন শুধু মাত্র সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জাহাঙ্গীরপুরীর ঠিকভাবে আইন না মানা কলোনিটিকেই বুলডোজারের আক্রমণের মুখে পড়তে হল তা নিয়ে প্রশ্ন করাই যেতে পারে। অবশ্য সরকারি আইনজীবীদের সাফাই মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ নয়, হনুমান জয়ন্তীর দিন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রতিক্রিয়াতেও নয়। এই ঘটনা নিতান্তই আইনানুগ ঘটনা। মেনে নেওয়া যায় না, ঘটনার আগের দিন, বিজেপি'র এক নেতা পুরসভায় যে চিঠি দিয়েছিলেন তার অর্থ ছিল জাহাঙ্গীরপুরীর দাঙ্গাবাজদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। বিজেপি'র বার্তা ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মুসলমানদের উপর সংগঠিত হামলাই চূড়ান্ত নয়, তাদের উপর আগামী দিনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আরও তীব্র হয়ে উঠবে। গোমাংস থেকে হিজাব বিতর্ক, বিজেপি'র সংখ্যালঘু নীতি নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।

এমনই এক সময়ে আমরা রয়েছি, নাগরিক সমাজ বা বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা বাদ দিলেও বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার শীর্ষ আদালতের নির্দেশকেও অমান্য করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। এই স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে Totalitarian বা একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপেই অগ্রসর হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সামান্য হলেও বিরোধী নেত্রী বৃন্দা কারাট এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আদালতের নির্দেশ হাতে নিয়ে ৭৫ বছরের "তরুণী" বৃন্দা কারাট ধ্বংস রথের ধ্বংসকাণ্ড কিছুটা থামাতে পেরেছেন। বৃন্দার দাবি, এই ধ্বংসযজ্ঞ শুধুমাত্র বেআইনি কলোনি ভাঙ্গার জন্যই নয়, সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যই সংগঠিত হয়েছে—এই উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা যে কেবল সংসদ ভবনের চত্বরেই সীমাবদ্ধ নয়, বিরোধী রাজনীতির অস্তিত্ব যে এখনও শেষ হয়ে যায়নি, বৃন্দা কারাট সেই কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ভারতে ক্রমবর্ধমান যক্ষার প্রকোপকেও মহামারি বলে ঘোষণা করা যেতে পারে

ভারতে এখন খাদ্য উদ্বৃত্ত। অথচ দুঃখ ও কৌতুকের ব্যাপার দেশটি এখনও অপুষ্টির কবল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পুষ্টির নিরিখে ভারতের অবস্থান এখনও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যেই পড়ে।

অপুষ্টি এবং অবৈজ্ঞানিক খাদ্যভ্যাসের কারণে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ নানা ব্যাধির সহজ শিকার হয়। জীবাণু সংক্রমণও সহজে ঘটে। বিশেষত অপুষ্টিজনিত কারণে যে রোগগুলির প্রাদুর্ভাব বেশি, যক্ষা তার মধ্যে অন্যতম। ভারতে প্রতি বছর অন্তত নয় লক্ষ মানুষ যক্ষায় আক্রান্ত হয় এবং চার লক্ষ মানুষ মারা যায়। বিশ্বে সর্বাধিক সংখ্যক যক্ষা রোগী ভারতে বাস করে। এই লজ্জাজনক তথ্য আমাদের সামনে থাকলেও যক্ষা নিবারণে সরকারি তৎপরতার অভাব চোখে পড়ার মতই ঘটনা। দীর্ঘদিন খাদ্যাভাবে জীর্ণ শরীর সহজেই এই কালান্তক ব্যধিতে আক্রান্ত হয় এবং এর মারণ ক্ষমতা উপেক্ষনীয় নয়। সাধারণত গরীব মানুষরাই এই রোগে আক্রান্ত হয় বলে মনে হয়। সম্ভবত সেজন্যই এই রোগ নিবারণে সরকারি নজরদারিতে এত ঘাটতি।

গত দু'বছরে যক্ষায় মৃত্যুসংখ্যা বেড়ে গেছে। এ বছরও যক্ষায় মৃত্যু সংখ্যা আরও বাড়ারই সম্ভাবনা। অথচ যথার্থ সরকারি উদ্যোগ, নজরদারি এবং উপযুক্ত পরিষেবার দ্বারা এই রোগকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব।

আসলে 'কোভিড' গরীব, বড়লোক বাছাই করে না, যক্ষায় মূলত গরীব মানুষই মারা পড়ে বলেই কোভিডের বিরুদ্ধে সরকারি উদ্যোগে অন্তত উৎসাহের অভাব না থাকলেও, যক্ষা নিয়ে তেমন উদ্যোগের এত অভাব। অবশ্যই যক্ষায় মৃত্যু সংখ্যাটা বেশ আতঙ্কজনক।

রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেডও (RINL) কী বিক্রি হওয়ার পথে?

বোঝা যাচ্ছে না কেন RINL কেও বিক্রি করার চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এমনই এক বার্তা দিয়েছেন।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে, বিশাখাপত্তনম স্টীল প্ল্যান্টের অধীনস্থ কর্পোরেট সংস্থা রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেডের (RINL) মোট বিক্রি হয়েছে ২৮,০০০ কোটি টাকা। গত বছরের এই সময়ে বিক্রির পরিমাণের চেয়ে ৫৬ শতাংশ বেশি কর দেওয়ার আগের হিসাব অনুযায়ী ৮৩৫ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে (Prtofit before tax)।

অর্থমন্ত্রী ২১ জানুয়ারি বলেছেন, বিশাখাপত্তনম স্টীল প্ল্যান্ট লাভজনক সংস্থা নয়। এই সংস্থার অধীনস্ত RINL —বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—VSP-র কর্মীরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেছেন এই সংস্থাটি দেশের অন্যতম বৃহত্তম ইস্পাত কারখানায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ৩ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৭.৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় এর উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২০ মিলিয়ন টনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সংস্থা ২০০২-০৩ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত লাগাতার মুনাফা অর্জন করেছে, দক্ষ পরিচালনা এবং পরিকল্পনার অভাবে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত লোকসানে চললেও ২০১৮-১৯ সংস্থা ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং মুনাফাও করেছে। কিন্তু ২০১৯-২১ কোভিডের জন্য VSP কে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। বিরাট সম্ভাবনাময় এমন এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিক্রি করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন।

অনলাইন গিগ-অর্থনীতি শ্রমিককে ন্যূনতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত করছে

তুষার চক্রবর্তী

শ্রমের মূল্য চুরি ও পুঁজির মালিকের উত্তরোত্তর মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনিবার্যভাবে একের পর এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করে। পুঁজিবাদী অর্থশাস্ত্রীরা পুঁজিবাদের ''সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোহারী ব্যাখ্যায়'' এই সংকট সৃষ্টির সমস্যাকে না পারে গিলতে, না উগরে দিতে। সচরাচর উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান দেওয়া হয়। যদিও, সেই ভাবের ঘরে চুরি পণ্ডিতদের নজর এড়াতে পারে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট সৃষ্টির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করাটাই মার্কসীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্তর্নিহিত এই দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এতকাল টিকে আছে কি ভাবে?

সংকট কাটিয়ে উঠে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার অনেক রকম উপায়ের মধ্যে একটি উপায় হল, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের নামে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার ওপর নির্ভরশীল সমাজের নব নব রূপান্তর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে শুধুমাত্র নিত্যনতুন পণ্য তৈরি করে তাই নয়, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও শ্রমিকের কাজের প্রকৃতি, বাজার ও তাদের নিয়ন্ত্রণ, এই সবকিছুর মধ্যেও অবিরত পরিবর্তন আনে। এমন সমস্ত পরিবর্তন যা সমাজকে পাল্টে দিলেও—আপাত উন্নয়নের আড়ালে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করে। শুধু যে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখে তাই নয়, এই সব পরিবর্তনই পুঁজিবাদকে আরো শক্তিশালী, বিস্তৃত অথচ কেন্দ্রীভূত রূপ দেয়। এরই পোশাকি নাম, নবীকরণ বা ইনোভেশন।

ইনোভেশন বা প্রযুক্তিভিত্তিক চমকদার অভিনব পরিবর্তনশীলতা তাই বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও টিকে থাকার প্রাণবায়ু হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে যা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধিতা না করেও—তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা পুঁজিবাদের প্রাণভোমরাকে টিপে মারবার দায়িত্ব রূপকথার নীলকমল লালকমলের মতো এ যুগের শ্রমিকশ্রেণি ও সমাজবাদীদের ওপরেই এসে পড়েছে। আমাজন, উবের, ওলা, সুইগী, জোমাটোর মতন ইন্টারনেট নির্ভর অনলাইন গিগ-অর্থনীতি, যা শ্রমিককে না-শ্রমিকে পরিণত করে একেবারেই নিংড়ে নিতে ওস্তাদ—তাদের এই কারণেই চিনে নেওয়া দরকার।

গিগ-অর্থনীতি :

ডিজিট্যাল প্রযুক্তি শ্রমবাজারের চরিত্রটাই বদলে দিচ্ছে। তারই ফল—গিগ অর্থনীতি। গিগ-অর্থনীতি কথাটা অনেকের কানে অচেনা ঠেকলেও ব্যাপারটা সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। ইন্টারনেট বিশেষ করে App নির্ভর বাণিজ্য ও পরিষেবা ও তার সঙ্গে যুক্ত অস্থায়ী শ্রমিক ও কর্মীদের নিয়েই এই অর্থনীতির কারবার। স্বল্প সময়ের ও অস্থায়ী—তাই গিগ। কার্যত এখানে সকলেই ক্যাজুয়াল লেবার, যদিও তাদের উল্লেখ করা হয় ফ্রিলান্সার বা স্বাধীন পেশাদার হিসেবে। এদের নিয়েই ডিজিট্যাল বাজার চলছে। আপনার দুয়ারে ওষুধ সহ যে কোনো পণ্য বা খাবারদাবার পৌঁছে দেয় যারা সেই আমাজন, ফ্লিপকার্ট, স্নাপডিল, ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত মেক মাই ট্রিপ, এয়ারবিনবি (airbnb), যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সির পরিবর্তে উবের (Uber), ওলা (Ola), রাপিডো (ইত্যাদি) গিগ-অর্থনীতির কারবারী। এদের শ্রমিক বা পরিষেবা প্রদানকারীরা যেভাবে খোলামেলা শর্ত সাপেক্ষে কাজ করে—সেটাই এর মূল চরিত্র। এখানে কাজ সাময়িক, প্রশিক্ষণ থাকলে তা স্বল্পমেয়াদী। কর্মীরা কাজ ও কাজের সময় ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারেন। একনাগাড়ে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন, আবার চাইলে দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। কাজের মজুরি ও কাজ, ব্র্যান্ড বা সংস্থা নয়—পরিষেবা ক্রয়কারীদের রেটিং- এর ওপর নির্ভর করে।

গিগ অর্থনীতিতে App-এর মাধ্যমেই অন লাইন পেমেন্ট করা দস্তুর। যদিও—ভারতের ক্রেতারা নগদ লেনদেন পছন্দ করেন বলে ভারতে নগদ কারবার খানিকটা মেনে নেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের কাজে যে স্বাধীনতা ও আপাত নমনীয়তা (flexibility) আছে তাকে তরুণদের মধ্যে চাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার, সরকারী ও বেসরকারী প্রথাগত কর্মক্ষেত্র লোপাট হয়ে যাচ্ছে বলে আজকের দিনের কর্মপ্রার্থীরা নিরুপায় হয়েও, সাময়িক সুরাহা ভেবেও, এই ধরনের কাজে ঢুকে পড়ছে।

আসলে, বিশ্বপুঁজিবাদ বর্তমান আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থে কর্মক্ষেত্রে দুটি বিরাট পরিবর্তন সুকৌশলে চাপিয়ে দিচ্ছে। একদিকে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে শ্রমিক ও কর্মসংকোচন চরমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তেমনি অন্যদিকে শ্রমিককে বানানো হচ্ছে না-শ্রমিক, তাকে বলা হয়ে স্বাধীন ঠিকাদার (independent contractor)। আর কোম্পানি হল আইনের ভাষায় প্লাটফর্ম বা চুক্তিমঞ্চের যোগানদাতা। ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপন আর মুনাফার ভাগ আদায় ছাড়া মূল কোম্পানি বা প্লাটফর্মের কোনো দায়দায়িত্ব কার্যত নেই। চুক্তিচ্যুতি ঘটলে তার দায় উপভোক্তা ও পরিষেবা পৌঁছবার প্রান্তিক শ্রমজীবী তথাকথিত স্বাধীন ঠিকাদার বা না-শ্রমিক, এই দুই পক্ষকেই বুঝে নিতে হবে। রেটিং শুধু মঞ্চ বা প্লাটফর্ম ব্যবহারে নিশ্চিতি দেবে না-শ্রমিক, অর্থাৎ স্বাধীন চুক্তিকারী ঠিকাদারকে। বিবাদ বিসংবাদ সবটাই ক্রেতা ও বিক্রেতা না-শ্রমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আজকের বাজারচালু খোলামেলা চুক্তিনির্ভর গিগ-অর্থনীতির এই হলো সারাৎসার।

এই গিগ-অর্থনীতি শ্রমিককে না-শ্রমিক চুক্তিকারী স্বাধীন ঠিকাদারে পরিণত করে কেড়ে নিচ্ছে শ্রমিকের সবরকম অধিকার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজির যোগসাজসে যা করা হচ্ছে। যেখানে যেখানে এমন হচ্ছে, সেখানে সেখানেই এই না-শ্রমিকের বিভ্রান্তিকর তকমা ঘুচিয়ে তাদের শ্রমিকে পরিণত করাটাই হওয়া উচিত আজকের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কাজ। দুঃখ এখানেই যে, সেই কাজটা তেমনভাবে হচ্ছে না। তবু, ভরসার কথা হলো, আজকের পুঁজিবাদের মক্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের গিগ-অর্থনীতিতে নিযুক্ত না-শ্রমিক ও নাগরিকেরাই সেই প্রয়োজনীয় কাজ অবশেষে শুরু করেছেন।

মার্কিন গিগ-অর্থনীতির না-শ্রমিক, আজ শ্রমিকের অধিকার দাবি করছে।

কোনো ধাপ্পাই খুব বেশিদিন চলেনা। মুক্ত বা স্বাধীন কাজের নামে যে আসলে কম টাকায়, কঠোর পরিস্থিতিতে, কোনো সুরক্ষা বা শ্রমিকের আইনি অধিকার ছাড়াই ঝুঁকি পূর্ণ কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা ধরে ফেলতে গিগ অর্থনীতির না-শ্রমিকরা যত বুঝতে লাগল—ততই ফুঁসতে লাগল। ক্রেতা আর কোম্পানি দুয়ের কাছ থেকেই সরাসরি লাঠি ঝাঁটা খেতে হচ্ছে এদের। অথচ এরা শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামে আদায় করা যে কোনো দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের বাইরে, যার পর নাই অসুরক্ষিত।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের শ্রমিক ও নাগরিক সমাজের, বিশেষ করে, আদালতের বিচারপতিরা ২০২০ সালে জানুয়ারী মাসে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে অ্যাসেম্বলি বিল ৫ পাশ করেন যা গিগ অর্থনীতির কোম্পানিদের ভাষায় স্বাধীন চুক্তিকারী না-শ্রমিকদের প্রকৃত শ্রমিকের অধিকার ফিরিয়ে দেয়। যা ছিল আমেরিকার শ্রমিকদের এক বিরাট বিজয়। কিন্তু, নির্বাচনের ফাঁকে এই বিজয়কে পাশ কাটাবার কৌশল গ্রহণ করে কর্পোরেট চক্র।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণভোট নেওয়ার ব্যবস্থাও থেকে। বেশ কিছু রাজ্যে এই ব্যবস্থা থাকলেও কালিফোর্নিয়া রাজ্য এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। যেমন চারটি অঙ্গরাজ্য বিনোদনমূলক ব্যবহারের জন্য গাঁজার বৈধকরণে সায় দিয়েছে। ওরেগন রাজ্য এমনকি আফিম থেকে তৈরি কোকেন ও হেরোইনের মতো তীব্র ও ক্ষতিকর নেশার বস্তুকেও মুক্ত করেছে। কিন্তু এমন নেতিবাচক ঘটনার চাইতেও, শ্রমিকদের প্রতিকূলে আরো নেতিবাচক ঘটনাও ক্যালিফোর্নিয়ায় সংগঠিত করা হলো। যাতে মদত দিলেন ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেটাই ছিল তার পার্টিং কিক বা শেষ-আঘাত। সেখানে গণভোটে ২২ নম্বর প্রস্তাব ৫৮ শতাংশ ভোটে পাশ হয়েছে—যা গিগ অর্থনীতির তথাকথিত স্বাধীন চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার বা না-শ্রমিকদের ইতিপূর্বে সংবিধান স্বীকৃত শ্রমিকের অধিকার আবার ছিনিয়ে নিয়েছে।

প্রস্তাব-২২ যাতে পাশ না হয় তার জন্যে আমেরিকার উবের সহ গিগ অর্থনীতির মুনাফালোলুপ কর্পোরেটেরা একযোগে ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটি মার্কিন ডলার প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রচারে বিনিয়োগ করেছিল। এটা নির্বাচনী প্রচার খরচের সমস্ত অতীত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। বস্তুত, নির্বাচনে ট্রাম্প সাহেবের পরাজয়ের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই গণভোটের ফল। আমাদের দেশে তো বটেই, সারা দুনিয়ার কর্পোরেট লালিত সংবাদ মাধ্যম যদিও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কর্পোরেটদের টাকার থলির এই আগ্রাসনকে চেপে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭৮ শতাংশ যেখানে গিগ-অর্থনীতির কবলে, সেখানে এই ঘটনার অভিঘাত যে কত গভীর—তা অবশ্যই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। গিগ অর্থনীতির চালকরা তাই আজ আর স্বস্তিতে নেই। তারা এই প্রথম এটাও বলছে—যে এই স্বাধীন-চুক্তিকারী না-শ্রমিকদের তারা আমেরিকার সব রাজ্যেই কিছু কিছু সামাজিক সুরক্ষা ফিরিয়ে দেবে। তারা যে, এই শ্রমিকদের ভেতরে ভেতরে ভয় পেতে শুরু করেছে সেটা তাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ভারতে একচেটিয়া পুঁজির বিস্তার ও মুনাফা লুণ্ঠনের প্রধান পরিসর যোগাচ্ছে গিগ-অর্থনীতি

এশিয়ার গিগ অর্থনীতির একেবারে একনম্বর জায়গায় উঠে এসেছে ভারত। খুচরো ব্যবসায় ওয়ালমার্টের মতো বিদেশি পুঁজিকে ঢুকতে বাধা দিতে গিয়ে ভারতের ছোটো ব্যবসায়ী বা উপভোক্তারা একজোট হয়ে প্রতিরোধের দেয়াল তুলতে সমর্থ হলেও—গিগ অর্থনীতির প্রসারের বেলায় তেমন কিছুই নজরে আসেনি।

আসলে, পুঁজিবাদ তাদের সাময়িক পরাজয় থেকে শিক্ষা নিলেও—শ্রমিকশ্রেণি ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিত্যনতুন ছলাকলা বিষয়ে নিজেদের নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা ও সচেতনতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ফাঁকে ভারতে জাঁকিয়ে বসেছে গিগ-অর্থনীতি, যার কুফল আজ ভারতের শ্রমজীবী মানুষের ওপর, বিশেষ করে বেকার তরুণ তরুণীদের ওপরে বর্তাচ্ছে।

ভারতে গিগ অর্থনীতির প্রসার বাড়তে বাড়তে আজ বাজার অর্থনীতির প্রায় ৩০ শতাংশ দখল করে নিয়েছে। বিশ্বায়িত কোভিড অতিমারী ও লকডাউন ছিল গিগ অর্থনীতির পৌষমাস। এশিয়ায় ভারতের পরেই এই ব্যাপারে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। যার ফলে, এই দুই দেশে, একদিকে ছোট ব্যবসায়ী ও পরিষেবা প্রদানকারী, অন্যদিকে খুচরো বাজারের কর্মী—দুয়ের ওপরেই বাড়ছে চাপ। মাঝখান থেকে ইন্টারনেট ও App প্রবাদপ্রতিম নেপোর মতন মুনাফার সবটুকু দই চেটেপুটে সাবার করছে। কোভিড শেষ হলেও বাজার অর্থনীতি আর যে সাবেকি ধাঁচে ফিরবে না, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। গিগ অর্থনীতি একদিকে ডিজিটাল প্লাটফর্ম নির্ভর অনলাইন পরিষেবার যোগান ও অন্যদিকে দুয়ারে সার্ভিস যুগিয়ে কাজের সংস্কৃতিকেই বদলে দিচ্ছে। যাপনচিত্রের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে গিগ অর্থনীতি।

ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, ভারতের বাজারের মন্দা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনেও গিগ অর্থনীতি কাজ করছে। শুধু পেট্রল, ডিজেলের দাম নয়—তার সঙ্গ গিগ-অর্থনীতির অদৃশ্য পুঁজির ফাঁদও বিস্তৃত। এসব নিয়ে আলোচনা হয় না বললেই চলে। এমনকি, উন্নত পুঁজিবাদী দেশের মধ্যেও জাপান গিগ অর্থনীতিকে অনুমোদন দেয়নি— নিজেদের দেশের কর্মী ও ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। অথচ জাতীয়তাবাদের ডঙ্কা পেটানো ভারতের পুঁজিবাদ তোষণকারী কংগ্রেস, বিজেপি বা শিবসেনা, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারে বসে থাকলেও সেই সাহস দেখাতে পারেনি। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এদের প্রেমের অভিনয়ের মুখোশ এই সব ঘটনা আলোচনায় আনলে, খুলে যেতে বাধ্য। সেই উদ্যোগ বামপন্থীদের নিতে হবে।

মানুষ কিছু আঁচ করছে—কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছেন না। তারা একে স্বাভাবিক পরিবর্তন বলে মেনে নিচ্ছেন, নিচ্ছেন কিছু কিছু সুবিধা, কিসের বিনিময়ে যে সেই সুবিধে মিলছে সেই অংক অনেকের কাছেই অজানা। এই জানানোর কাজটাই গিগ-অর্থনীতির শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ বিরোধী, সমাজবাদী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের পুঁজিবাদের নবতম চক্রান্তকে পরাস্ত করতেই হবে।

বালিগঞ্জ বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের বামপ্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার

সৌম্য শাহীন

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের সায়রা শাহ হালিম ছিলেন বামফ্রন্টের প্রার্থী। ভোটে হেরেও হৃদয় জিতে নিয়েছেন বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া দেউচা, আনিস, রামপুরহাটের আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে গেছে, নির্বাচনের ফলাফল তার একটা স্বীকৃতি মাত্র। এই নির্বাচনে কমরেড সায়রা হালিমের হয়ে গণ আন্দোলন কর্মীদের একাংশ প্রচার করেছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে বাংলার রাজনীতিতে গত কয়েক মাসে তিনটে সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১. শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের পেটোয়া রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ রাজনৈতিক বিরোধীদের গণতান্ত্রিক পরিসরটুকু দিতে রাজি নয়। আমার জানা মতো কমরেড সায়রা শাহ হালিমের সমর্থনে ডাকা মোট সাতটি জনসভা বাতিল করা হয়েছে। এবং কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের অর্থ এসেছে তৃণমূল ভবন থেকে। দাঙ্গাকারী বাবুল সুপ্রিয়র জয়ের পথ সুগম হবে না, এটা ভালোভাবেই জানতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে সায়রা কী পোশাক পরেন, কোন ভাষায় কথা বলেন, হিজাব- বোরখা পরেন কিনা, এইরকম অপ্রাসঙ্গিক সব বিষয় নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসিত প্রচার চালিয়েছেন।

২. গত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার নাগরিক সমাজের একাংশ এবং অন্তত তিনটি রাজনৈতিক দল, যথাক্রমে সিপিআইএমএল (লিবারেশন), সিপিআইএমএল (রেডস্টার) এবং এমকেপি ''নো ভোট টু বিজেপি'' নামক একটি ক্যাম্পেন করে। ছাত্রসংগঠন আইসা এবং পিডিএসএফ এই প্রচারে যোগ দেয়। এখানে একটু ইতিহাস ঘাঁটা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মহামন্দা এবং ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং হিটলার-মুসোলিনি কর্তৃক সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা মুছে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে সপ্তম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে গ্রেগরি দিমিত্রভ 'The Fascist Offensive and the Tasks of the Communist International in the Struggle of the Working Class against Fascism" শীর্ষক থিসিস পেশ করেন। আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম ২০২১ সালের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে দিমিত্রভের তত্ত্বের কতটুকু প্রাসঙ্গিকতা আছে তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ না করেই বিজেপিকে আটকাতে ''লেসার ইভিল'' তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা বলা হয় 'নো ভোট টু বিজেপি' মঞ্চের পক্ষ থেকে। আন্দোলনকর্মীদের অন্য অংশটি ''ভোট ফর লেফট'' প্রচার করলেও সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ অর্থ এবং মিডিয়া অনুগ্রহের অভাব। সম্প্রতি কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে এক ভয়ানক তথ্য উঠে এসেছে—নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার ''এনজিও এবং অন্যান্যদের'' ৩৮০০০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকার একটা অংশ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, 'নো ভোটটু' পন্থী প্রকাশনা সংস্থা, ফিল্ম ক্লাবকে পুষ্ট করেছে—এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। এবং তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে লেসার ইভিল তত্ত্বের প্রয়োগ যে চূড়ান্তভাবে ভুল, সেকথা স্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী, গণতন্ত্র হত্যাকারী মমতা সরকার নির্বাচনে জেতার এক বছরের মধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে। আরএসএসের দুই শাখা—বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেসে বিভিন্ন সুবিধাবাদী নেতার অবাধ চলাচল দেখতে দেখতে গুলিয়ে যায় যে কে কখন কোন দলে। গ্রেটার ইভিল মুকুল, রাজীব, সব্যসাচী, বাবুল সুপ্রিয়রাই আজ লেসার ইভিল হয়েছেন। দেউচা পাচামি এবং ঠুড়গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ঘিরে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত যাবতীয় উদ্বেগকে অগ্রাহ্য করে আদিবাসী জমি অধিগ্রহণ, রামপুরহাটে গণহত্যা, প্রতিবাদী ছাত্রনেতা আনিস খানের বাড়িতে পুলিশ ঢুকিয়ে তাকে খুন, হাঁসখালীতে তৃণমূল নেতা কর্তৃক গণধর্ষণের পরে মৃতার চরিত্রহনন, রামনবমীকে কেন্দ্র করে বিজেপির সাথে প্রতিযোগিতামূলক হিন্দুত্বের লড়াই-এরকম অজস্র উদাহরণ পেশ করা যায় যার মাধ্যমে দাঁত নখ বের করে নিজেদের সাম্প্রদায়িক এবং লুম্পেন, বুর্জোয়া চরিত্রকে বেআব্রু করে ফেলেছে তৃণমূল সরকার। ২০২৪ এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্নকে সফল করতে গেলে প্রয়োজন কর্পোরেট আনুকূল্য। তাই নিজের শিল্পবিরোধী ভাবমূর্তিকে বদলাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে ডাকা ধর্মঘট, সম্প্রতি দুদিন ব্যাপী শিল্প ধর্মঘট ভাঙতে পুলিসের সাথে সাথে ক্যাডার বাহিনীকেও রাস্তায় নামিয়েছেন তিনি। একদিকে ইঁট- বালি-পাথর-সিমেন্ট মাফিয়াদের সিন্ডিকেটরাজ, পুর-পঞ্চায়েত স্তরে সরকারি টাকা নিয়ে দুর্নীতি, অন্যদিকে বড়ো পুঁজিকে নিজের পক্ষে টানতে নির্বিচারে জমি অধিগ্রহণ—এই হলো তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান রণকৌশল। দুর্বৃত্তায়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে কার্যত জঙ্গলরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাঙ্গাবাজ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বাবুল সুপ্রিয়কে বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করার মাধ্যমে মমতা বুঝিয়ে দিলেন যে একদিকে সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হওয়ার আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতেও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করবেন তিনি, আবার অন্যদিকে হিন্দুদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা দিলেন যে শুধুমাত্র বিজেপি নয়, হিন্দুরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনিও পরিপূর্ণভাবে সক্ষম।

৩. এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিমকে লড়তে হয়েছে একদিকে তৃণমূল-বিজেপির বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে, অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থীর ব্যক্তিঘৃণা নির্ভর অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। কলকাতা পুরসভার ৬৪ ও ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআইএম প্রার্থী যথাক্রমে ১৫৩টি ও ৩৫৬টি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়কে পরাজিত করেছেন। আরেকটা আনন্দের খবর হলো বিজেপি এবং কংগ্রেস-উভয় দলের প্রার্থীর আমানত জব্দ হয়েছে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, কমরেড সায়রা হালিম ছিলেন পার্ক সার্কাসের এনার্সি-ক্যা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। জয়েন্ট ফোরাম এগেনস্ট এনার্সি সহ বিভিন্ন গণ সংগঠন এই নির্বাচনে তাঁর পক্ষে প্রচার করেছে, পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেছে। এমনকি সিপিআইএমএল (লিবারেশন) তাদের পুরনো অবস্থান বদলে বৃহত্তর বাম ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করেছে, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আশা করবো, বাকি বামপন্থী দলগুলিও তাদের পথ অনুসরণ করবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে কোন বামপন্থী মানুষের সাথে বিরোধ নেই, বড়জোর রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে। বহু মানুষ যেনতেনপ্রকারেন বিজেপিকে আটকাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সেই আবেগের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। এবং স্পষ্ট করে বলেছি, দালাল মিডিয়া বা ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রকৃত বিজেপি-বিরোধী মানুষকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সময় এখন বৃত্তটাকে সম্প্রসারিত করার, এবং সেখানে অবশ্যই বড়ো বাম দলগুলোর দায়ে অনেক বেশি।

কিন্তু রাজানুগ্রহী সুশীল সমাজ বা পেটোয়া সংবাদমাধ্যমের কাছে সেই প্রত্যাশা নেই। তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখতে সদা ব্যস্ত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ৩০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে সায়রা প্রমাণ করে দিয়েছেন, যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই একমাত্র বামপন্থীরাই করে চলেছেন, তা সে গণ আন্দোলনের ময়দানে হোক, বা সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায়। এবং এই দুই ধারার লড়াই একে অপরের পরিপূরক, ফলে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই লড়তে গেলে গণ আন্দোলনের পরিসরকে সম্প্রসারিত করতেই হবে।

শহীদ মিনারে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের উদ্যোগে মে-দিবস উদ্‌যাপন

গত রবিবার মে দিবস উপলক্ষে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যৌথ উদ্যোগে শহীদ মিনারে প্রতি বছরের মতো এবারও মে-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। মাঝখানে অতিমারির কারণে দুটি বছর মে দিবস উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতা থাকেনি। রাজ্যের খেটেখাওয়া মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম শুধু নয়, . দেশ বিদেশের শ্রমজীবী শ্রেণির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের অঙ্গীকার গ্রহণের প্রেক্ষিতে শহীদ মিনারের এই সমাবেশ যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৩ সালে পরাধীন ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়। বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেই শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এই মহতী সভায়। এই সভায় মূল প্রস্তাবে ঐতিহাসিক ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে লড়াই এবং হে মার্কেটের সভা ও বিভিন্ন কারখানার সামনে পুলিশের নির্বিচার গুলি চালনার ইতিহাস তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সভায় ১ 'মে দিবস' রূপে পালনের সিদ্ধান্তের কথাও স্মরণ করা হয়

প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী আগ্রাসী নীতিগুলির কঠোর সমালোচনা করা হয়। কার্যত স্থায়ী কাজের অধিকার, অসংগঠিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষাকারী অধিকার সংকুচিত এবং অধিকাংশই লুণ্ঠিত। অন্যদিকে চলছে নির্বিচার বিলগ্নীকরণ, বেসরকারিকরণ। জলের দরে কর্পোরেটদের হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দিচ্ছে মোদি সরকার। অন্যদিকে রাষ্ট্রিক নিপীড়ন নেমে আসছে প্রতিটি প্রতিবাদী কর্মী, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী প্রভৃতির উপরে। এভাবেই পুঁজিবাদ তাদের সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে শ্রমজীবী মানুষদের ঘাড়ে। পাশাপাশি ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতগত বিভেদপন্থার প্রাচীর গড়ে আন্দোলনগুলি বিভ্রান্ত করার পথ নিচ্ছে সংঘ পরিবার নির্দেশিত কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজ্যের পরিস্থিতি ভীষণই ভয়াবহ। নির্বাচনগুলি দুর্বৃত্তদের দাপটে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছে বার বার। তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হামলা চলছে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের উপরেও। এদিকে ধর্ষণ, খুন নিত্যদিনের ঘটনা। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। অথচ খেলা মেলাসহ দানদাক্ষিণ্য চলছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়। আর রাজ্যে প্রতিটি আন্দোলন এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহূত ধর্মঘটও দমন করা হচ্ছে পুলিশ এবং শাসকদলের দুষ্কৃতীদের লেলিয়ে দিয়ে। এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যকে সংহত করে আগ্রাসী নয়া উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠন সহ, মহিলা ছাত্র যুব, কৃষিজীবী মানুষ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয় এই প্রস্তাবে।

শহীদ মিনারে আহূত এই সভায় কম. এ এল গুপ্তা (এ আই টি টি ইউ সি) কম. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সি আই টি ইউ) কম. লীলা চ্যাটার্জী (এ আই টি ইউ সি) কম. দীপক সাহা (ইউ টি ইউ সি) প্রমুখ আটজন শ্রমিক নেতাকে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠন করা হয়।

সভাপতি কম. গুপ্তার প্রারম্ভিক ভাষণের পর মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কম. অনাদি সাহু (সি আই টি ইউ)। এরপর একে একে মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কম. বিপ্লব ভট্ট (এ আই টি ইউ সি), কম. স্বপন ঘোষ (এ আই ইউ টি ইউ সি), কম. প্রবীর ব্যানার্জী (টি ইউ সি সি), কম. অতনু চক্রবর্তী (এ আই সি সি টি ইউ), কম. তপন সেন (সি আই টি ইউ), কম. অশোক ঘোষ (ইউ টি ইউ সি), কম. অনিমেষ মিত্র (বি এস এন এল), কম. সমীর ভট্টাচার্য্য (১২ জুলাই কমিটি), কম. জয়দেব দাশগুপ্ত (ব্যাঙ্ক, বি ই এফ আই)। মে দিবসের সভায় যোগদানকারী শ্রমিক কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কম. সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

তিন বছর পর মে দিবস উদ্‌যাপনের এই ঐতিহ্যশালী সভায় এবার উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো। উত্তোলিত রক্তপতাকা আর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত মহানগরীর রাজপথ এরাজ্যে খেটেখাওয়া মানুষের সংগ্রামী ভূমিকার স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

মে দিবসে ইউ টি ইউ সি'র সদর দপ্তরে রক্তপতাকা উত্তোলন।

মে দিবসে বউবাজারে ইউ টি ইউ সি'র সদর দপ্তরে সকাল দশটায় রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ। প্রারম্ভিক ভাষণে মে দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন রাজ্য সম্পাদক কম. দীপক সাহা। এরপর সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ বলেন, কিভাবে শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে ক্রমশ অর্জিত অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে দেশে বিদেশে। রাষ্ট্র দেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক অধিকার ক্রমশ কেড়ে নিচ্ছে পুঁজির স্বার্থে। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের আহ্বান রাখেন তিনি। এই মে দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভাগ নিয়েছেন সংযুক্ত হকার্স ইউনিয়ন, প. ব. মিষ্টান্ন কর্মচারী ইউনিয়ন, চটকলের বি পি সি এম ইউ, ডিভিসির কর্মচারী সহ উত্তর ও মধ্য কলকাতার ছাত্র যুব কর্মীরা।

এছাড়া ইউ টি ইউ সি সদস্যরা দুটি পথসভা ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মে দিবস উদযাপন করেন তালতলাতে যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং ধর্মতলার মোড়ে মোহন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে।

আর এক ইঞ্চিও নয়

জাহাঙ্গীরপুরী। দিল্লির উত্তর পশ্চিম প্রান্তে প্রায় হরিয়ানার সীমান্তে অবস্থিত এই জনপদে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোনো প্রাসাদ বা তার ধ্বংসাবশেষ নেই। এমনকি, কোনো দিন তিনি এখানে এসেছিলেন কিনা তাও বলা মুশকিল। বাস্তবে ১৯৭৫-এর আগে সেই অর্থে এখানে কোনো জনবসতিও ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় দিল্লির সৌন্দর্যায়নের জন্য মিন্টো রোড, থমসন রোড, মন্দির মার্গ, গোল মার্কেট, চাণক্যপুরীর মতো অভিজাত এলাকার বস্তির বাসিন্দাদের উৎখাত করে মহানগরীর একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘটা করে এই জনপদের শিলান্যাসও হয়েছিল। সেই শিলালিপিতেই প্রথম জাহাঙ্গীরপুরীর নাম উল্লেখ করা হয়। ভালো করে খোঁজখবর করলে সেই প্রস্তরখণ্ডের দেখা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

পরিবার পিছু সাড়ে বাইশ বর্গ গজ অর্থাৎ সিকি কাঠা জমি দিল্লি প্রশাসনের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছিল। এইভাবেই দিল্লি পুরসভার নথিতে লিপিবদ্ধ আরও ১৭৩১টি ঝুপড়ি-ঝুগ্গি কলোনি বা চলতি ভাষ্যে জে জে কলোনির সঙ্গে তালিকাভুক্ত হয়ে যায় জাহাঙ্গীরপুরী। দিল্লির জে জে কলোনিগুলির জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি বলে অনেকের ধারণা। বেশিরভাগ জে জে কলোনি বেআইনি হলেও জাহাঙ্গীরপুরী নয়।

নবনির্মিত বস্তির ভেতরকার রাস্তা, নর্দমা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির বন্দোবস্ত প্রশাসনই করে দেয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য থেকে আসা গরিব মানুষ যারা, এতদিন অভিজাত দিল্লিতে সরকারি বাবুদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার কাজে কয়েক প্রজন্ম ধরে নিযুক্ত ছিল তাদের ঠাঁই হল জাহাঙ্গিরপুরীতে। হারিয়ে গেল তাদের রুটিরুজির এতদিনের পুরোনো ব্যবস্থা। কাজেই খুঁজে নিতে হল রোজগারের নতুন পন্থা।

কাছেই ছিল উত্তর দিল্লির জঞ্জাল জড়ো করার জায়গা, ভালসোয়া। অনেকটা কলকাতার ধাপার মাঠের মতো। তবে আকারে আয়তনে অনেক বড়ো। সেই জঞ্জাল থেকে প্লাস্টিক, লোহার টুকরো, তামা-পিতল ভাঙা ইত্যাদি বাছাই করার পর বাজারে বিক্রি করে চলত প্রতিদিনের খাদ্যের সংস্থান। এবং বিষয়টি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, সেই সময় জাহাঙ্গীরপুরী থেকে যাতায়াত করা ছিল বেশ কঠিন।

তবুও তারা টিকে ছিল। হারিয়ে যায়নি। ঘরে ঘরে যক্ষা। প্রায় প্রত্যেকেই চর্ম রোগে আক্রান্ত। সারাদিন ধরে জঞ্জাল ঘাঁটলে চর্মরোগ না হওয়াই অস্বাভাবিক। তবে পরবর্তী প্রজন্ম গাড়ি মেরামত থেকে শুরু করে ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি কাজে জড়িয়ে যায়। মেট্রো রেলের প্রথম পর্যায়ের হলুদ লাইনের প্রান্তিক স্টেশন জাহাঙ্গীরপুরীতে নির্মিত হওয়ায় নতুন সহস্রাব্দে যাতায়াত সহজ হয়ে গেছে। উপার্জন বেড়েছে। বেড়েছে জনসংখ্যা। ২০০১-এ হয়েছে প্রথম আদমশুমারি। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির জন্য সিকি কাঠা জমির উপরেই গড়ে তুলতে হয়েছে দোতলা-তিনতলা। প্রায় প্রতি পাড়ায় নির্মিত হয়েছে মন্দির। মসজিদও আছে। মসজিদের আজান এবং মন্দিরের আরতিতে কোনও লড়াই নেই। রামনবমী, শিবরাত্রি, ঈদ, হোলি, দেওয়ালি এখানে মিলেমিশেই উদযাপিত হয়। অন্তত ২০২২-এর ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত এমনটাই ছিল জাহাঙ্গীরপুরী।

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত একটি উগ্র মৌলবাদী সশস্ত্র শোভাযাত্রা ১৬ এপ্রিল জাহাঙ্গীরপুরী পরিক্রমা শুরু করে। রমজানের উপবাস শেষে ইফতারের জন্য স্থানীয় মসজিদের সামনে সমবেত হয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। অভিযোগ উঠেছে যে সময় শোভাযাত্রা থেকে ধর্ম বিদ্বেষী প্ররোচনা সৃষ্টি হয়। ইট ছুঁড়লে পাটকেল ফিরে আসে। এমনটাই চিরকালীন দস্তুর। হারিয়ে যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ। পুলিশ নীরব দর্শক। ফলাফল, দুই সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন আহত। জনাকয়েক পুলিশও আহত।

এখানে ঘটনার সমাপ্তি হলে নিশ্চয়ই ভালো হতে পারত। কারণ এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অভিঘাত দিল্লির অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু বাস্তবে তা হতে না দিয়ে অন্য অজুহাতে আবার জাহাঙ্গীরপুরীতেই আক্রমণ হানা হয়েছে।

শাসকদলের রাজ্য সভাপতি মঙ্গলবার ১৯ এপ্রিল উত্তর দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এনডিএমসি) মেয়রের কাছে দাবি করলেন জাহাঙ্গীরপুরীর অবৈধ নির্মাণকে অবিলম্বে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। মেয়র দেরি করেননি। কৃষক আন্দোলনের সময় পুরোনো দল ছেড়ে তিনি সদ্য শাসকদলের সদস্য হয়েই মেয়র হয়েছেন। আনুগত্য প্রকাশের এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে!

মেয়রের আবেদনে সাড়া দিয়ে বুধবার ২০ এপ্রিল সকাল ৮টার আগেই জাহাঙ্গীরপুরীতে মোতায়েন করা হল এক বিশাল নিরাপত্তা বাহিনী। এসে যায় সাতটি বুলডোজার। পরে জানা যায় সেগুলি উত্তরপ্রদেশের হরদোই থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। দিনে ৮ হাজার টাকা ভাড়া। ডিজেল-মোবিল ইত্যাদির খরচ আলাদা।

সকাল সোয়া দশটা নাগাদ শুরু হয় ধ্বংসযজ্ঞ। বাসিন্দারা কী ঘটছে তা দেখার জন্য তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় লোকেদের সরু গলিতে আটকে রেখে নিজেরা ছাদে উঠে যায়। সংবাদে প্রকাশ এক হাজারের বেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।

সকাল সওয়া দশটায় প্রথম বুলডোজারটি কুশল সিনেমা চকে প্রবেশ করে। সাড়ে দশটা নাগাদ কাজ শুরু করে দ্বিতীয় বুলডোজার। তারপর একে একে আরও পাঁচটি। শুরু হয় ধ্বংসে অভিযান। কুশল চককে কেন্দ্র করেই অবৈধ উচ্ছেদ অভিযানের নামে চলতে থাকে বৈধ নির্মাণ অপসারণ। দোকান, বাড়ির সিঁড়ি এবং বারান্দা থেকে মসজিদের সদর দরজা কিছুই বাদ পড়েনি।

জাহাঙ্গীরপুরীর জি-ব্লক, ডি-ব্লক ও অন্যান্য কয়েকটি ব্লকও অল্পবিস্তর ধ্বংসের শিকার। তবে সি-ব্লকের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। এখানেই প্রশ্ন ওঠে হঠাৎ করে সি-ব্লককে মূল লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হল কেন? আসলে কুশল চকের পাশেই রয়েছে জাহাঙ্গীরপুরীর সি-ব্লক। সেটাই সম্ভবত মূল লক্ষ্য। কারণ সি-ব্লক মুসলমান অধ্যুষিত মহল্লা বলেই পরিচিত। তার উপর এখানেই বেশিরভাগ বাংলাভাষী মানুষের বসবাস। তারা মূলত মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া এবং মালদহের বাসিন্দা। এদের বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশই নির্মাণ কাজে জড়িত। তাছাড়া রামগড় পাড়ায় রয়েছে সিপিআই(এম)-এর একটি স্থানীয় দপ্তর, অনেকদিন ধরেই যা সক্রিয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে মুসলমান, কমিউনিস্ট ও তথাকথিত বাংলাদেশী উৎখাতের জন্য এই সুপরিকল্পিত এবং অঘোষিত আক্রমণ।

মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী অবৈধ নির্মাণ সে স্থায়ী বা অস্থায়ী যাই হোক না কেন অপসারণের জন্য পাঁচ থেকে পনেরো দিনের নোটিশ দিতে হয়। এমনকি এমন নোটিশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার আইনেই রয়েছে। শাসক কবেই বা আইন মেনে চলে! ধ্বংসের কাজটি দুপুর দুটোয় শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অথচ কোনো অজ্ঞাত কারণে সকাল ন'টায় বৈধ কলোনিতে শুরু হয়ে যায় বুলডোজার অভিযান।

সকাল এগারোটায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ জারির খবর সারা দেশের সঙ্গে জাহাঙ্গীরপুরীতেও ছড়িয়ে পড়লে বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাটোপে আরও দু' ঘণ্টা ধরে চলে বুলডোজারের ধ্বংসকান্ড। আশ্চর্য সমাপতন! ঠিক সেই সময় গুজরাটের বুলডোজার কোম্পানি পরিদর্শন করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। বুলডোজার নির্মাতা জেসিবি (Joseph Cyril Bamford Excavators Limited, Uttoxeter, Staffordshire, The UK) যে আদতে ব্রিটিশ কোম্পানি। টিভি এবং সমাজমাধ্যমের দৌলতে তামাম ভারতবর্ষ সকাল এগারোটায় জারি করা স্থগিতাদেশ কয়েক মিনিটের মধ্যে জেনে গেল। পুলিশ অফিসারদের স্মার্টফোনের পর্দায়ও হয়তো খবরটা দেখা গিয়েছিল। তবুও তাঁদের এককথা,— আদালতের মোহর লাগানো কাগজ হাতে না আসা পর্যন্ত অভিযান থামানো যাবে না।

সুপ্রিম কোর্ট থেকে জাহাঙ্গীরপুরী দূরত্বের হিসেবে উনিশ-বিশ কিলোমিটার। আর সময়ের নিরিখে, গাড়িতে পঁচিশ-তিরিশ মিনিট। তবুও এপ্রিল মাসের কুড়ি তারিখে কী জানি কী কারণে সকাল এগোরোটায় জারি করা সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ জাহাঙ্গীরপুরীর উচ্ছেদ অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে লালবাতি গাড়িতে চড়ে আদালতের নির্দেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেওয়ার অনেক আগে সেখানে পৌঁছে গেলেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত। আদালতের নির্দেশনামা হাতে নিয়ে চালু বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ে স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলেন, —"আর এক ইঞ্চিও নয়।"

থমকে গেল সাতটা বুলডোজার। তড়িঘড়ি ছুটে এলেন কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার। সেদিনের মতো স্থগিত রইল উচ্ছেদ অভিযান।

পরিকল্পিতভাবে জাহাঙ্গীরপুরীর ধ্বংসের ছক কাটা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত বিভাজনের জন্যই যে এই প্রশাসনিক অভিযান সংগঠিত হয়েছিল তা এখন সকলেই বুঝতে পারছেন। আদালতের নির্দেশ, দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া বিরুদ্ধ জনমত ইত্যাদি সামাল দিতে হিন্দুত্ববাদীদের বিভিন্ন সংগঠন এখন অন্য সুরে প্রচার শুরু করেছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উৎখাতের জন্য এই বুলডোজার আক্রমণ চালানো হয় বলে প্রচার হচ্ছে। যদিও বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সেই প্রচারে যুক্ত হয়েছে নতুন দাবি। দিল্লির যে সব জায়গার নামের সঙ্গে কোনো আরবি বা ফার্সী শব্দ (তাদের ভাষ্যে মুসলমান নাম) জড়িয়ে আছে তাদের নাম পাল্টে দিতে হবে। আবারও এক আশ্চর্য সমাপতন! হঠাৎ করেই ভালসোয়ার আবর্জনা ক্ষেত্র ২৭ এপ্রিল জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল। জাহাঙ্গীরপুরীর প্রথম প্রজন্মের বাসিন্দারা যারা এখনও চলাফেরা করতে পারে তারা ওই আবর্জনা ক্ষেত্র থেকেই বিক্রয়যোগ্য প্লাস্টিক, তামা, লোহা ইত্যাদি কুড়িয়ে আনার অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। তাদের সামান্য খুদকুঁড়ো সংস্থানের ব্যবস্থাটুকুও ছাই হয়ে গেল। অর্থাৎ যারা হাতে মারা পরেনি তাদের ভাতে মারার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত।

গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে সেই স্বৈরাচারী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বিরোধী রাজনীতির দায়িত্ব। বৃন্দা কারাত ও তাঁর সহকর্মীরা সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আদালতের নির্দেশ হাতে নিয়ে তিনি বুলডোজারের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর প্রতিরোধের সামনে থামতে বাধ্য হয়েছে শাসকের ধ্বংসরথ। সে দিনের উচ্ছেদ বন্ধ করিয়েই থামেননি বৃন্দা, তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই উচ্ছেদের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, এই দাবি করে আদালতের কাছে উচ্ছেদ বন্ধ করার আবেদন করেছেন। অর্থাৎ, গণতন্ত্রে বিরোধীর ভূমিকা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, প্রবীণ সি পি আই (এম) নেত্রী পথে নেমে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। সংসদের কক্ষ থেকে ওয়াকআউট অথবা টিভি চ্যানেলে এবং সমাজমাধ্যমে গা-গরম করা শব্দ উচ্চারণের বাইরেও যে আজকের ভারতে বিরোধী রাজনীতির অস্তিত্ব আছে, বৃন্দা কারাত সেই প্রায়-বিস্মৃত কথাটি মনে করিয়ে দিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টির মতো স্বঘোষিত বিজেপি-বিরোধী দলগুলি যা করতে চায়নি, কংগ্রেসের মতো প্রবীণতম রাজনৈতিক দল যা করতে পারেনি, তথাকথিত প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়া দলের প্রবীণ নেত্রী সেই কাজটি করে দেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্বৈরাচারের আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে এই মুহূর্তে সমস্বরে গভীর প্রতীতির সঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে, —আর এক ইঞ্চিও নয়।

সৌজন্যে—আরেকরকম (সম্পাদকীয়)

গান্ধী আশ্রমে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন

শিবসেনা বনাম বিজেপি'র দ্বৈরথ ভালই জমেছে। ভারত সফররত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে যাওয়া নিয়ে শিবসেনার দলীয় মুখপত্রে কটাক্ষ করা হয়েছে। গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গড়সেকে মহিমান্বিত করে যেই দল, তারাই আবার বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানেরা এদেশে এলে গান্ধীর সবরমতী আশ্রমেও নিয়ে যায়। বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ বিভিন্ন বিজেপি'র নেতানেত্রীরা গান্ধী হত্যাকারী গড়সের পক্ষে ওকালতি করেছেন, তাকে একজন প্রকৃত দেশভক্ত হিসাবেও তুলে ধরা হয়েছে—এই নিয়ে বিতর্ক চললেও বিজেপি'র নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এর আগে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও সবরমতী আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিজেপি-র গড়সে প্রীতিতে কোনও চিড় না ধরলেও, আন্তর্জাতিক জগতে গান্ধী ভারতের প্রতিভূ। তাই ভাবমূর্তির খাতিরেই বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের সফরসূচীতে গান্ধী আশ্রমকেও রাখা হয়।

চেন্নাই-এ আর এস পি'র কর্মীসভা

গত ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ু রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আর এস পি সদস্যদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। চেন্নাই এগমোর মিউজিয়ামের কাছে এক্সা সভাগৃহে আর এস পি সদস্যদের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মনোজ ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সাংসদ কমরেড এন. কে. প্রেমচন্দ্রন, কেরল রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য বর্ষীয়ান নেতা কমরেড পি এস হরিহরণ, কম. কোরানি শিবু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সকাল এগারোটায় কানায় কানায় পূর্ণ সভাগৃহে শুরু হয় দলের প্রায় ১৮-১৯টি জেলা থেকে আগত আর এস পি কর্মীদের সাধারণ সভা। তামিলনাড়ু রাজ্যের কন্যাকুমারী, মাদুরাই, কাড্ডালোর, থেনি, ধর্মপুরী, কোয়েম্বাটুর, সালেম, চেন্নাই, ত্রিনুলভেলি, ভিলুপুরম, ডিন্দিগাল, কৃষ্ণাগিরি, নাগেরকোয়েল, কারুর, তিরুপুর, মায়লাদুয়ারা প্রভৃতি জেলা থেকে সদস্যরা উপস্থিত হন। সভায় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

এই সভায় স্বাগত ভাষণ দেন কম. হরিহরণ। তিনি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং সমস্ত সদস্যদের মনোনিবেশ সহকারে সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কম. এন. কে. প্রেমচন্দ্রন। সভাপতির প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বর্তমান সময়ে মোদি সরকার যে উগ্রতার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করে চলেছে তার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বিশেষ করে, দেশের সংবিধানের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ এবং তা বিকৃত ও বিধ্বস্ত করার যে কর্মসূচি বিজেপি গ্রহণ করে চলেছে তার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন। কম. প্রেমচন্দ্রন বলেন যে, মোদির অপশাসনকালে সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষের জীবন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেকারত্বের প্রকোপে ধ্বংসের মুখোমুখি। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সমস্ত বামপন্থী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আগামীদিনে তামিলনাড়ু রাজ্যে আর এস পি'র শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে আশা ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সভায় প্রধান বক্তা দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য প্রথমেই উপস্থিত সমস্ত সদস্যদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। তিনি পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক অপশাসনের বিরুদ্ধে মরণজয়ী সংগ্রামের একটি বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে বহুসংখ্যক বিপ্লবী কর্মী যাঁরা কারান্তরালে থেকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নিবিড় পাঠ নিয়েছিলেন, তাঁরাই ১৯৪০ এর ১৯ মার্চ, বিহারের রামগড়ে অনুষ্ঠিত আপস বিরোধী সম্মেলনের মঞ্চে আর এস পি'র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিস্তারিতভাবে সেই অগ্নিশ্রাবী সময়খণ্ডের ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃত সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুশীলন এবং বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নে আর এস পি প্রথম থেকেই একনিষ্ঠ। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এবং দোলায়মান অস্থিরচিত্ত মধ্যপন্থী নেতারা বস্তুত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ আপস করেই ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েই স্বাধীন ভারত নির্মিত হয়েছিল। দেশের সম্পত্তিবান পরিবারগুলির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন প্রথমাবধি ভারতের দুর্বল সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে আপস করেছেন। এদেশে যে পথে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারতো, সেই পথে চলতে দেননি তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব। তাঁরা বাধা সৃষ্টি করেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে আপস রফার মাধ্যমেই চলতে চেয়েছেন। আর এস পি মনে করে যে, আধাখেঁচরাভাবে পরিত্যক্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচি একমাত্র সমসমাজ গড়ার তীব্র গণআন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন যে, দেশের সর্বত্র যে সমস্ত বন্ধুরা আর এস পি'র সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের সবাইকেই নিবিড়ভাবে দলের নীতি আদর্শ উপলব্ধি করতে হবে। বুঝতে হবে এবং সততার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। তিনি আর এস এস-এর মতো একটি ফাসিস্ত সংগঠনের ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশদে উল্লেখ করেন। এই উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনটিই বিজেপিকে পরিচালিত করে। এই সংগঠনের গতিবিধি বিশেষভাবে প্রতিহত করার কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, দলের সদস্যদের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্কসবাদী লেনিনবাদী ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য প্রাথমিক প্রচেষ্টা সমস্ত সদস্যকেই গ্রহণ করতে হবে। বস্তুবাদী দর্শনের প্রচার অবহেলিত হলে আরও বেশি করে ভাববাদী দর্শন আশ্রিত ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়েই চলবে। বর্তমান ভারতে যেভাবে অসহিষ্ণুতা এবং অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের অফুরান চক্রান্ত চলছে তা, দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য সংহতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করেই চলবে। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের চক্রান্ত চলছে। মোদির ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ এবং শ্রমিক কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষদের জীবনে সর্বনাশ সাধনের অপচেষ্টা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন।

কম. ভট্টাচার্য নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, আর এস পি কোনও একক ব্যক্তির নেতৃত্বে চলে না। ব্যক্তি নেতা নিশ্চিতই উদ্যোগ নেবেন কিন্তু সংগঠন চলবে সামূহিক নেতৃত্বে। দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সুঠামভাবে চলতে হবে। তিনি নির্দেশ দেন যে, আগামী চার মাসের মধ্যে সমস্ত জেলার সদস্যপদ অভিযান চলবে এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই তামিলনাড়ু রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠনের কর্মসূচি নিতে হবে। রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে কম. হরিহরণকে আহ্বায়ক করে একটি ১৭ জনের প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন।

কম. মনোজ ভট্টাচার্যর বিস্তারিত বক্তব্য সংক্ষেপে অনুবাদ করেন কম. জেকব স্ট্যানলি।

দুপুর ২টা থেকে প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমস্ত সদস্যরাই অংশগ্রহণ করেন। সভায় স্থির হয় যে, সদস্যপত্র সংগ্রহের কর্মসূচিতে আরও তৎপর হতে হবে। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। নির্দিষ্ট রসিদ বই এর মাধ্যমেই তা করতে হবে এবং কঠোরভাবে হিসাব রাখতে হবে। কম. সাধারণ সম্পাদক এই সভায় বিস্তারিতভাবে দলের গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। কোয়েম্বাতুরের নেতা কম. মোহন তা অনুবাদ করেন।

ডিভিসিতে শ্রমিক কর্মচারীদের সংগ্রামী মঞ্চের কাছে পরাজিত আই এন টি টি ইউ সি

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ গোপন ব্যালটে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে স্বীকৃতি নির্ধারণের ভোটে ইউ টি ইউ সি, সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি'র বামগণতান্ত্রিক সংগ্রামী মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ ডিভিসি ট্রেড ইউনিয়নসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গত ছ'বছর ব্যাপী স্বীকৃত ইউনিয়ন তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত ডিভিসি কামগড় সঙ্ঘ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

এবার এই স্বীকৃতি সম্পর্কিত নির্বাচনী লড়াই-এর আগে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে শ্রমিক ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ সি) নামে এবং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনী চিহ্নে (ছাতা) যৌথ মঞ্চ করে নির্বাচনে লড়াই করা হবে। মজদুর ইউনিয়ন (এ আই টি ইউ সি) এবং কর্মচারী সংঘ (আই এন টি ইউ সি) সংগ্রামী মঞ্চের কর্মসূচি এবং নির্বাচনী কৌশলের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে।

এই নির্বাচন নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সমগ্র ভ্যালিতে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। ডিভিসি সদর দপ্তর কলকাতা ও মাইথনে ভোট গণনা হয়। খড়্গপুর, কোলাঘাট, হাওড়া ডিভিশন, বেলুড় সহ কলকাতা সদর দপ্তরের ভোটগণনা হয়েছে ডিভিসি সদর দপ্তর ডিভিসি টাওয়ার্সে। আর মেজিয়া, দুর্গাপুর, অণ্ডাল, চন্দ্রপুরা, মাইথন, পাঞ্চেত, বোকারো, কোনার সহ মোট ২৬টি কেন্দ্রের ভোট গণনা হয়েছে মাইথনের কম্বাইন্ড বিল্ডিংয়ে।

ইউনাইটেড ফোরাম ৫৬.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে দর কষাকষির একমাত্র ক্ষমতা অর্জন করেছে। ফোরাম পেয়েছে ২০৫২ ভোট। কামগড় সঙ্ঘ পেয়েছে ১৩৫২ এবং বি এম এস পেয়েছে মাত্র ২১৭ ভোট।

সংযুক্ত মঞ্চের বিপুল জয়ে ডিভিসি শ্রমিক কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য, ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ, শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বাসুদেব আচারিয়া, সহ-সভাপতি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, কর্মচারী সঙ্ঘের নেতা জয়মঙ্গল সিংহ, এ আই টি ইউ সি'র নেতা উজ্জ্বল চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

২০১৭ সালের নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়া সত্ত্বেও সর্বাধিক ভোট পাওয়ার সুবাদে কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে তৃণমূল প্রভাবিত ইউনিয়ন ডিভিসি কামগড় সঙ্ঘকে স্বীকৃতি দেয়। গত পাঁচ বছর ধরে রাজ্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই ইউনিয়নটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনৈতিক সমঝোতা করে নিয়মকানুন বহির্ভূত প্রোমোশন, বদলি সহ বেতন সংশোধন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কার্যত বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অথচ ফোরাম গত চার বছর ধরে, এমনকি অতিমারির দুঃসময়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করে গেছে। বার বার কর্তৃপক্ষ এই সব দাবিদাওয়া পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কামগড় সঙ্ঘের সঙ্গে সহযোগিতা ও চক্রান্ত করে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে।

এবার স্বীকৃতি লাভের পর লড়াইয়ের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দর কষাকষির নৈতিক অধিকার অর্জিত হয়েছে বলে মনে করেন স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তাপস কুন্ডু। তিনি বলেন যে অধিকার অর্জনের মূল্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমবিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে এই সংগ্রামী ঐক্যকে হাতিয়ার করেই এগিয়ে যেতে হবে।

অক্সফ্যাম সমীক্ষা : দরিদ্র দেশগুলি চরম বিপর্যয়ের মুখে

আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের যান্মাষিক সভায় ওয়াশিংটনে অক্সফ্যাম পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা ভয়ঙ্কর মুদ্রাস্ফীতি, কোভিড-১৯ এবং লকডাউন জনিত দুর্দশা ইত্যাদির জন্য ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে চলেছে সে বিষয়ে বিশদ তথ্য পেশ করে।

খাদ্য এবং জ্বালানির অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কোভিড মহামারির জন্য চূড়ান্ত ধনবৈষম্যের কবলে পড়তে চলেছে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। প্রথমে সংকট, পরে বিপর্যয়ে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ দারিদ্রের স্তরে নেমে আসবে। ইতিমধ্যে দৈনিক ৫.৫ ডলার কম আয় করেন এরকম মানুষের সংখ্যা ৩৩০ কোটি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি। এই সময় বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক ধনকুবেরদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। অক্সফ্যাম সুস্পষ্টভাবে বলেছে, মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে জনগণকে শোষণ করে কর্পোরেট সংস্থাগুলি দ্রুত মুনাফা বৃদ্ধি করছে। তেলের সঙ্কটের সুযোগে তেল কোম্পানিগুলিও মুনাফার রেকর্ড করছে। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী সংস্থা, আই এম এফ এবং বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির চাপে গরীব দেশগুলি আরো গরিব হয়ে পড়ছে। এবছর গরিব দেশগুলিকে ৪৩০০ কোটি ডলার ঋণশোধ করতে হবে। ২০২১ সালে এই দেশগুলি স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং সামাজিক পরিষেবার উপর যে পরিমাণ ব্যয় করেছে তার ১৭৯ শতাংশ ঋণ শোধ করতে হবে। অক্সফ্যামের সুপারিশ অবিলম্বে অতিমারির মোকাবিলায় যে ঋণ মকুব করা হয়েছে তা কার্যত সমুদ্রের কাছে গোস্পদ মাত্র। জি-২০ ইতিপূর্বে যে ১০০০০ কোটি ডলার সহায়তা দেবে বলেছিল, তার তুলনায় মাত্র ৩৬০০ কোটি ডলার দিয়েছে। এভাবে ঋণগ্রস্ত দেশগুলি ক্রমশ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ায় আপামর জনগণ ন্যূনতম জীবনজীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঋণের দায়ে বেসরকারিকরণ এবং ছাঁটাই শুধু নয়, সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রিক পরিবেশ প্রত্যাহৃত হবে শ্রীলঙ্কার মতো আরও অনেক দেশে।

আই সি ডি এস কর্মীদের অধিকারের স্বীকৃতি

(আই সি ডি এস : সুপ্রিম কোর্টের স্মরণীয় রায়)

অশোক ঘোষ

সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আইসিডিএস ও অন্যান্য স্কিম কর্মীদের সমস্যাবলীর গভীরে প্রবেশ করে এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। বিচারপতিদ্বয় ৭২ পৃষ্ঠার রায় দিয়ে বলেছেন, অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকারা কর্মজীবনের শেষে গ্রাচুইটি পাবেন। এই রায়-এর মাধ্যমে বিচারপতিরা স্কিম কর্মীদের কার্যত সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন। এই রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, এদের প্রতি রাষ্ট্র উদাসীন আর সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

আজ থেকে ৪৭ বছর আগে ২ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে শুরু হয়েছিল ''মা ও শিশুদের কল্যাণকর প্রকল্প'' আই সি ডি এস। ভারতের মতো আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশে, আই সি ডি এস, আশা, মিড ডে মিল, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা মা ও শিশুদের পুষ্টি, শিশু মৃত্যু কমানো, গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা, ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া, স্কুলের ছাত্রদের দুপুরের খাওয়া ইত্যাদি বহু ধরনের কাজ এরা করেন। বিশেষত মা ও শিশুদের অপুষ্টি কমানো আর শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য। সারা দেশে স্কিম কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এই প্রকল্পগুলিতে মুখ্যত মহিলারাই কর্মরত। সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে এই স্কিম কর্মচারীদের অবদান স্বয়ং সরকারও অস্বীকার করেনি। অথচ এরা বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে চির বঞ্চিত।

''বারো ঘণ্টার স্বেচ্ছাশ্রমে'' (মুখ্যত আশা কর্মীরা) কার্যত দেশের সরকার যাদের বাধ্য করেছে, তারা দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত শ্রমজীবী নারী সমাজ। অঙ্গনওয়াড়ী ও আশা প্রকল্প দুটি সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মা ও শিশুদের জন্য কতটা কার্যকর তা সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে বোঝা যায়। রায় ছিল প্রকল্পের অধীনে যে কেন্দ্রগুলি ছিল তা যেন প্রতিটি জনবসতিতে চালু হয়। অর্থাৎ এই প্রকল্পটিকে সর্বজনীন করতে হবে। এই ধরনের প্রকল্পের দ্বারা একটি জাতির উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তোলা সম্ভব, যদি এই প্রকল্পের কাজগুলি যথাযথ পরিচালনা করা যায়। অঙ্গনওয়াড়ী ও আশা প্রকল্পের কাজের ফলে শিশু মৃত্যু, প্রসূতি মায়ের মৃত্যু কমেছে। এই কর্মীদের অক্লান্ত কাজের ফলে দেশ পোলিও মুক্ত হয়েছে। স্কুল ছুট শিশুর সংখ্যা কমেছে। গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই শিশু বিকাশ প্রকল্পটি অনবদ্য। এই প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করে ও নিয়মানুসারে পরিচালনা করলে দেশের বৃহৎ অংশের জনসাধারণের দারিদ্র অবশ্যই কিছুটা কমবে ও অশিক্ষা দূর হতে পারে। আমাদের দেশের সরকার কোনও দিনই প্রকল্পগুলিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয় নি।

বর্তমানে রাজ্যে মোট ৪১৬টি প্রকল্প চলছে, ২ লক্ষ ২৮ হাজার কর্মী সহায়িকা কাজ করছেন। এই স্কিম কর্মীরা কেউই বেতন পান না। এদের ভাতা দেওয়া হয়। সকলেই প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ভাতা পান। আশা কর্মীরা মাসে ৪৫০০ টাকা ভাতা সহ বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজ করার জন্য সামান্য কিছু ইনসেনটিভ পেয়ে থাকেন। কিন্তু সব মিলিয়ে যে টাকা এদের হাতে আসে তা একশো দিনের কাজের মজুরির থেকেও কম। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পেয়ে থাকেন ৭৫০০ টাকা, সহায়িকারা পান মাসে ৫৫০০ টাকা।

গত ১৬ বছরে কেন্দ্রে পরপর ইউপিএ সরকার ও এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। কিন্তু উভয় সরকারই স্কিম কর্মচারীদের দাবি দাওয়ার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও প্রকল্প কর্মীদের অনেক কাজে ব্যবহার করেছেন কিন্তু জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা দেখা যায়নি।

কেন্দ্রের দুই সরকারের আমলেই আই সি ডি এস প্রকল্পটি ব্যক্তি মালিকানায় এবং পঞ্চায়েতের হাতে হস্তান্তরের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রকল্পগুলি যথাযথ কার্যকরের উদ্যোগ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারের এই মানসিকতার ফলে কার্যত দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী পরিবার পরিষেবা প্রাপ্তির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশের সরকার এখন প্রকল্পগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে, ঘুর পথে বেসরকারিকরণের পথ নিয়েছে। আই সি ডি এস প্রকল্পটি সরকার ''মিশন মোডে'' রূপান্তরিত করছে। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী একটি রেজিস্টার্ড সংগঠন হবে। ডিরেক্টর থেকে সবাই মিশনের কর্মী হবেন। এই মিশন এখন বিভিন্ন রাজ্যে এনজিও'দের দায়িত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫-১৬ সালে এই প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করেছিল। তারপর থেকে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করার পরিবর্তে প্রতি বছর প্রকল্পগুলিকে ছোট করে আনার পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পের নামে ৮টি রাজ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের নির্দেশিত পথে আই সি ডি এস-এর পরিবর্তে মিনি আইসিডিএস প্রকল্প খোলা হয়েছে। সেখানে পুষ্টিকরখাদ্য সরবরাহের ও বিতরণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত, এনজিও এমনকি কর্পোরেট হাউসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সহায়িকার পদ তুলে দেওয়া, কর্মীদের ভাতা কমানো ইত্যাদি ঘটেছে।

সরকার এদের কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, এরা কোনও সামাজিক সুরক্ষার (প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কোনও ন্যূনতম বেতন নেই, বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বেতন, অবসরের পর নেই গ্রাচুইটি, পেনশন। শূন্য হাতে ঘরে ফিরে যাওয়া। কারণ দেশের সরকার এদের স্বেচ্ছাসেবক মনে করেন, আর এদের যেহেতু সরকারী কর্মচারী বলে গণ্য করা হয় না তাই এরা সর্বপ্রকার আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ইতোপূর্বে এই কর্মচারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যত সরকার আজ পর্যন্ত নির্বিকল্প। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত ৪৫তম ''ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে'' বিস্তারিত আলোচনার শেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় ''স্কিম কর্মীদের সরকারী কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে।'' পরের বছর ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ৪৬তম ''ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে'' পুনরায় স্কিম কর্মীদের বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে আনা হয়। এই সম্মেলনেও পুনরায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় ''সামাজিক সুরক্ষার বিধি ব্যবস্থা সহ সরকারী কর্মচারীর স্বীকৃতি'' দেওয়ার।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দেশের শ্রমবিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ ক্ষেত্র ''ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স বা ভারতীয় শ্রম সম্মেলন। দেশের গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্য যে, গত ২০১৫ সালের পর থেকে আর ভারতীয় শ্রম সম্মেলন হচ্ছে না। শ্রম সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনার সব রাস্তাই সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।

কার্যত সুপ্রিম কোর্টের রায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ও সহায়িকাদের বুকের ওপর জমে থাকা পাথর আর গলার কাছে আটকে থাকা কান্না অনেকটাই হাল্কা করে দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে সরকার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ কার্যকর করবেন।

মোদি সরকারের নির্লজ্জ দুর্নীতি

দেশের সর্ববৃহৎ হেলিকপ্টার পরিষেবা প্রতিষ্ঠান পবন হংস লিমিটেডের ৫১ শতাংশ মালিকানা জলের দরে মোদি সরকার স্টার লাইন মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে মাত্র ২১১ কোটি টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। অথচ এই স্টার লাইন মোবিলিটি কোম্পানিটি গত ২৯ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অর্থাৎ মাত্র ছয় মাস আগে মুম্বাই-এ রেজেস্ট্রীকৃত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছিল স্টার লাইনের ৫১ শতাংশের বাজার দর ৫০০ কোটি টাকা সরকারের ঘরে আসবে। এতই নির্লজ্জ দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকার যে পবন হংস লিমিটেডের ৫০ শতাংশের ভিত্তিমূল্য ২০০ কোটি টাকা ধার্য করে মাত্র ২১১ কোটি টাকায় স্টার লাইন মোবিলিটি কোম্পানির কাছে কার্যত জলের দরে বেচে দিয়েছে। স্টার মোবিলিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান মহারাজা এভিয়েশনের মাত্র ৩টি হেলিকপ্টার আছে, যার দুটির নিত্যযাত্রী পতঞ্জলির মালিকদ্বয় রামদেব এবং বালাকৃষ্ণ। দ্বিতীয় সহযোগী বিগ চার্টার দিল্লি হাইকোর্টে ঈজেন এভিয়েশনের সঙ্গে মামলায় ফেঁসে আছে। তৃতীয় সহযোগী এ্যালসস গ্লোবাল অপরচুনিটি ফান্ডের এই প্রসঙ্গে কোনো ভূমিকা নেই। আর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পবন হংস লিমিটেড বর্তমানে ৪৩টি হেলিকপ্টার সচল রেখেছে যাদের দেশব্যাপী যোগাযোগ এবং উদ্ধারকার্যে ভূমিকা ভীষণই প্রশংসনীয়। ও এন জি সি, যাদের পবন হংসে ৪৯ শতাংশ শেয়ার রয়েছে তারা এদের হেলিকপ্টার সর্বদাই ব্যবহার করে। হাল-এর হয়ে পবনের ছটি ধ্রুব হেলিকপ্টার বি এস এফের দরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়। পবনের দশ লক্ষ উড়ান-ঘণ্টা এবং এক লক্ষ ল্যান্ডিং-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে পবন সর্বদাই লাভের মুখ দেখে আসছে। এমন কি ২০১৪-১৫ সালেও সরকারকে এই হেলিকপ্টার কোম্পানি ২২৩.৬৯ কোটি টাকা ডিভিডেন্ট দিয়েছে।

২০১৭ সালে সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি পরিবহন পর্যটন সংস্কৃতি দপ্তরের রিপোর্টে এই সব সংস্থায় বিলগ্নিকরণের চরম বিরোধী মতামত দিয়েছে। এমনকি পবনের শ্রমিক কর্মচারীরা এগিয়ে এসে এর ৫১ শতাংশ মালিকানা ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই বধির এবং স্বার্থান্বেষী সরকার কখনো কি কোনো সুপ্রস্তাবে সম্মতি জানাতে পারে? রাফায়েল চুক্তির মতো আর একটি নির্লজ্জ দুর্নীতির মূলচক্রী হতে চলেছে মোদি সরকার।

ইউ টি ইউ সি'র সঙ্গে শ্রমমন্ত্রীর বৈঠক

গত ১৪ এপ্রিল ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষের সঙ্গে দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে আলোচনা হয়। ইউটিইউসি'র পক্ষ থেকে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের সংস্কার প্রস্তাব সহ শ্রম আইন সংশোধনের বিরোধিতা করে একগুচ্ছ দাবিপত্র পেশ করা হয়।

১০ জন কর্মচারী কাজ করে ও ২১ হাজার টাকা বেতন পর্যন্ত সকল কর্মচারীদের ইপিএফও'র অন্তর্ভুক্ত করা, প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ইএসআই-এর চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ইপিএফও'র ন্যূনতম পেনশন ৫০০০ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নের ইপিএফও'র ও ইউএসআই'র কেন্দ্রীয় বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব সহ আই এল ও সম্মেলনে যোগদান নিশ্চিত করার বিষয়সমূহ আলোচনা হয়।

ইউটিইউসি'র নেতৃত্ব ''সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আলোচনার পদ্ধতিতেই'' গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিষয়ে মন্ত্রীও সহমত হয়েছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়টিকে মন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাজ্যব্যাপী মে দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ মে, ২০২২ রাজ্যব্যাপী প্রতি জেলায় আর এস পি এবং ইউ টি ইউ সি'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর ইউ টি ইউ সি অফিস সহ ইসলামপুর, মনীন্দ্রনগর, কাশিমবাজার, বেলডাঙ্গার মহুলা আমতলা, বড়োঞা, ভরতপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সুতী-১ এবং সুতী-২ পার্টি অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করে মে-দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি পার্টি অফিসে মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রক্তপতাকা উত্তোলন, গণসঙ্গীত এবং মোটর সাইকেল মিছিল সংগঠিত হয়। বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিক যথেষ্ট সংখ্যায় মে দিবস উদযাপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্য কমিটির সদস্য কম. পুলক মৈত্র এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার ঢাকুরিয়া, লালাবাগান পার্টি অফিসে মে দিবস উপলক্ষে রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়।

হুগলি জেলায় বলাগড়, খানাকুল, পুরশুড়া, চুঁচুঁড়া, শ্রীরামপুরে মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামপুরে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের সদস্যবৃন্দ গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। মে দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নেতৃবৃন্দ। পুরুলিয়া জেলায় জইপুরে ইউ টি ইউ সি অফিসে মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। জেলায় রিক্সা ও বিড়ি শ্রমিকরা মে দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেন। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন বিড়ি শ্রমিক নেতা কম. মনোরঞ্জন মাহাতো। নদীয়া জেলার রানাঘাটে ইউ টি ইউ সি'র কার্যালয়ে মে দিবসে পতাকা উত্তোলন করা হয়। রানাঘাট সুভাষ এ্যাভিনিউতে মে দিবসের শহীদদেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মে দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। বিকেলে রানাঘাট পুরসভার প্রাঙ্গন থেকে সি আই টি ইউ এবং ইউ টি ইউ সি'র উদ্যোগে বিশাল মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ দমদম ও পানিহাটিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মে দিবস পালিত হয়। বোলপুরে জেলা সদর দপ্তর ক্রান্তি ভবনে মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

Vol. 68 Issue No. 50 শনিবার ৩০ এপ্রিল, ৭ মে ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

রাশিয়া-ইউক্রেন (পশ্চিমী উস্কানি)

দিলীপ গোস্বামী

১৯৯০ সালে সোভিয়েত নেতৃত্বকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বদিকে ন্যাটো এক ইঞ্চিও অগ্রসর হবে না—ন্যাটো সামরিক জোটের মধ্যে ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত রাশিয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রাশিয়া ক্ষুব্ধ। বর্তমান সঙ্কটের ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং অসংখ্য কারণের মধ্যে সামরিক জোটের পূর্বদিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা অবশ্যই একটি কারণ। অস্বীকার করা যায় না।

রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের শুরু থেকেই পশ্চিম দুনিয়া এবং অধিকাংশ গণমাধ্যমের চিল-চিৎকার রাশিয়া বিনা প্ররোচনায় এক শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা থেকে সহস্র যোজন দূরে থেকে এই চিৎকারে গলা মিলিয়ে বললেন, রাশিয়া বিনা প্ররোচনায় ইউক্রেন আক্রমণ করেছে। একই সঙ্গে (পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন) রাশিয়া এবং পুতিনের বিরুদ্ধে অনেক কূটনৈতিক বিচারে অশোভন উক্তি করেছেন। বাস্তব ঘটনা, ঠাণ্ডা যুদ্ধ অবসানের পর থেকে গত তিন দশক পশ্চিম দুনিয়ার রাশিয়াকে প্ররোচিত করার ধারাবাহিক ইতিহাস গণমাধ্যম লাগাতার অস্বীকার করে চলেছে। অবশ্য যে কোনও যুদ্ধের প্রথম বলি 'সত্য ঘটনা', এক্ষেত্রে তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

রাশিয়ার সবচেয়ে বড় অভিযোগ এবং ক্ষোভের কারণ, NATO কেন বার্লিন দেওয়াল ভেঙ্গে দেওয়ার পর এক দশকের মধ্যেই প্রদত্ত সব প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে একতরফা পূর্ব দিকে, রাশিয়ার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে চলেছে? আমেরিকার ঐতিহাসিকেরা এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা অস্বীকার করতে পারেন না, ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারীর এইচ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব জেমস বেকারের প্রতিশ্রুতি ছিল NATO পূর্বদিকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে যাবে না।

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে মিখাইল গর্বাচেভ স্পষ্ট ভাষায় আমেরিকা, ফরাসী, ব্রিটিশ এবং পশ্চিম জার্মানীর নেতৃত্বকে বলেছিলেন NATO-র স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। এর পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা মস্কো স্বীকার করবে না। পররাষ্ট্র সচিব জেমস বেকারও গর্বাচেভকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বা প্রেসিডেন্ট বুশ, জার্মানীর সংযুক্তিকরণের যে প্রক্রিয়া চলছে তাকে একতরফা ভাঙ্গবেন না এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনও পক্ষই জয়ী বা পরাজিত হচ্ছে না। জার্মানীর সফল সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে নিরাপত্তার নতুন এক পরিকাঠামো নির্মিত হতে চলেছে। দুর্ভাগ্য, আমেরিকা এবং পশ্চিম দুনিয়ার এই প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ হয়নি বরং উল্টোটাই ঘটে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু ওয়ারশ চুক্তি বাতিল করে আশা করেছিল ওয়াশিংটনও সদিচ্ছার পাল্টা প্রমাণ দিয়ে সামরিক জোট (NATO) ভেঙ্গে দেবে—যে জোট মূলত পূর্ব দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্লকের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যই নির্মিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টও ওয়ারশ চুক্তি বাতিল হওয়ার পর NATO -র অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন নেই—এমন কথাই গর্বাচেভকে বলেছিলেন, যাই হোক প্রাক্তন ওয়ারশ' চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে পশ্চিমের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর, ওয়াশিংটন এবং তার সাকরেদরা আমেরিকান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় সতর্কবাণী উপেক্ষা করতে সময় নষ্ট করেনি। রাশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক NATO-র অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে।

প্রথম দিকে NATO -র অনেক নেতাই পোল্যান্ড, বুলগেরিয়াকে NATO সদস্য পদ দিতে গররাজী ছিলেন। জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোল গর্বাচেভকে বলেছিলেন, NATO-র ঐ সময়ের স্থিতাবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না। NATO-র আয়তন অপরিবর্তিত থাকবে। মস্কো জার্মানীর নেতার অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে জার্মানীর সংযুক্তিকরণের পর প্রাক্তন পূর্ব জার্মানীতে NATO-র ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতিও দিয়েছিল।

এরপর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পরে। ১৯৯২ সালে বিল ক্লিন্টন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এদিকে বরিস ইয়েলৎসিনের জমানায় সামগ্রিকভাবে রাশিয়ার অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। আমেরিকা এই সুযোগে NATO সম্পর্কে যাবতীয় প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী নখদন্ত বিস্তারে বিলম্ব করেনি। প্রসঙ্গত ঐ সময়ে ক্লিন্টন প্রশাসনের উপরতলার অনেকেই, যাঁদের মধ্যে ছিলেন রবার্ট গেট্স-CIA-র ডিরেক্টর এবং এমন অনেক প্রবীণ মানুষ, যাঁরা ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাব্লিক প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন, ক্লিন্টনের কাছে এক যৌথ পত্রে সতর্ক করেন মার্কিন নেতৃত্বে NATO -র পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা নীতিগত ভাবে এক ঐতিহাসিক ভুল হবে, স্বাক্ষরদান কারীদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা এবং CIA -র ডিরেক্টর স্যানসফিল্ড টার্নার। ঐ পত্রে বেশ জোরের সাথেই উল্লেখ করা হয়েছিল, "Nato expansion will be opposed by the entire political spectrum in Russia and will bring Russians to question the entire post-cold war political settlement."

আমেরিকার প্রশাসনের বহু উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যাঁদের মধ্যে ছিলেন রাশিয়ার প্রাক্তন নেতা জর্জ এফ কেন্নান, যিনি ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক কারিগর, NATO -র কর্মপরিধি বাড়ানোর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, "I think it is the beginning of a new cold war, ...it is a tragic mistake."

ক্লিন্টন প্রশাসন আমেরিকান নিরাপত্তা সংস্থা এত সব সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই ১৯৯৯ সালে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, চেক্ রিপাব্লিককে ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত করে এবং ২০০৪ সালে বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং স্লোভাকিয়া ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। ধুলায় লুণ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেওয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি। আজ যারা অষ্টপ্রহর পুতিন এবং রাশিয়াকে গালমন্দ করছেন তাঁরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবেই বিস্মৃত হয়েছেন। প্রসঙ্গত ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। এস্তোনিয়া সেন্ট পিটার্সবার্গ (লেলিনগ্রাড) থেকে ১০০ মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত। উইলিয়াম বার্নস ২০০৮ সালে মস্কোতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বার্নস সতর্ক করেছিলেন যে, "Any move to include Ukraine in NATO would touch a "raw nerve in Russia কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"। ২০০৮ সালে NATO ঘোষণা করে ইউক্রেন এবং জর্জিয়ার জন্য ন্যাটোর দরজা উন্মুক্ত করা হল।

উপরোক্ত ঘটনাবলি শুধুমাত্র রাশিয়াকে ঘিরে ফেলা বা পূর্ব ইউরোপের এই অঞ্চলগুলিতে রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করার কৌশল ছাড়াও রাশিয়ার বিশ্বাস ন্যাটো কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ রাশিয়ার নিরাপত্তা ভয়ঙ্করভাবেই বিপর্যস্ত হবে এবং আখেরে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। তাছাড়া ইউক্রেনের NATO -র সদস্যপদ দেওয়া নিয়ে ইউক্রেনের মধ্যেও মতদ্বৈধতা আছে। রাশিয়ার মূল অধিবাসীদের এক বড় অংশই ইউক্রেনের NATO র অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী নয়। এই বিরোধিতা ইউক্রেনে গৃহযুদ্ধের সূচনা করতে পারে। এমন অনভিপ্রেত ঘটনার সৃষ্টি হলে রাশিয়াকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই ঝামেলায় হস্তক্ষেপ করবে কিনা।

এবার ক্রিমিয়ার দিকে এক ঝলক নজর দেওয়া যেতে পারে। ক্রিমিয়া তো ইউক্রেনেরই অংশ ছিল, রণকৌশলগত দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত সেভাস্তাপুলে রাশিয়ার নৌ ঘাঁটি রয়েছে। ইউক্রেনের NATO -র সদস্য হওয়ার অর্থ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি রাশিয়ার হাত ছাড়া হয়ে যাবে রাশিয়ার কাছে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের পর বন্ধ হয়ে যাবে। ন্যাটো ইউক্রেনকে তার পরিধি বা অক্ষের মধ্যে গ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রাশিয়া ক্রিমিয়াকে রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। রণকৌশলগত বিবেচনায় NATO-র আগ্রাসী কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া যা, উচিত ছিল রাশিয়া ঠিক সেই কাজটাই করেছিল।

এদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যে নিতান্ত অর্বাচীনের মতো কার্যকলাপে অভ্যস্ত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যাবতীয় ঘটনা পরম্পরা অস্বীকার করে বলে চলেছেন ইউক্রেনকে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার (অর্থাৎ NATO র অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা) অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। পুতিনের দাবি, ইউক্রেনকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবেই গণ্য করতে হবে। পুতিনের বক্তব্য ছিল এই প্রকার :—নীতিগতভাবে কোনও দেশকে কার সঙ্গে জোট বাঁধবে কি বাঁধবে না সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দলিলপত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত এক দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন অন্য প্রতিবেশী দেশের নিরাপত্তায় বিঘ্ন না ঘটায় তাও বিবেচনা করতে হবে। পুতিন কোনও রাখ ঢাক না রেখে সতর্ক করেছিলেন ইউক্রেনের NATO তে যোগদান সরাসরি রাশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। রাশিয়া এটা বরদাস্ত করবে না।

এতদসত্ত্বেও রাশিয়ার যাবতীয় পরামর্শ, এবং সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেই গত কয়েক বছর ইউক্রেন NATO র সহযোগী দেশ হিসাবে কাজ করছে। NATO সামরিক বাহিনী ইউক্রেনীয় অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে এবং ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বস্তুত NATO-রই অংশে পরিণত হয়েছে NATO সদর দপ্তর থেকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেও কোনও অসুবিধা নেই।

২০১৪-র পর থেকে মস্কোর সাথে পশ্চিমের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ওয়াশিংটন এবং ব্রুসেলস-এর প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ইউক্রেনে নয়া নাৎসি এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীদের তাণ্ডব বাড়তে থাকে।

প্রসঙ্গত ২০১০ সালে রুশ ভাষী জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে ভিক্টর ইয়ানোকোভিচ (Victor Yanukovyeh) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর সিদ্ধান্ত, ইউক্রেন নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাঁর সিদ্ধান্তে ইউক্রেনের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ক্রুদ্ধ হয় এবং প্রমাণিত সত্য যে, তদানীন্তন ওবামা প্রশাসন ইউক্রেনের জমানা পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই ক্ষোভের আগুনে ইন্ধন জোগাতে থাকে। বলা বাহুল্য, ওবামা প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল যে ভাবেই হোক, ইউক্রেনের রাজনৈতিক চলার পথের পরিবর্তন করতেই হবে। ২০১৪ সালে এর প্রতিবিপ্লবী উত্থানের পর দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীরা পশ্চিমের প্ররোচনা ও সমর্থনে ইউক্রেনের ক্ষমতা দখল করে।

রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের অন্যতম আরও একটি কারণ, পশ্চিমের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত ইউক্রেনের উগ্র জাতীয়তাবাদী সরকার ক্রিমিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। ক্রিমিয়া রাশিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরই ইউক্রেন- ক্রিমিয়ার জলের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। জল সরবরাহ বন্ধ করার জন্য নীপার (Dnipar) নদীর উপর একটি বাঁধও নির্মাণ করেছিল। রাশিয়ান সেনা অভিযানের প্রথম সপ্তাহেই জল সরবরাহ চালু রাখার জন্য এই বাঁধটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রাশিয়ান সেনা অভিযানের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইউক্রেনের আকাশকে NO FLY ZONE হিসাবে ঘোষণা করার জন্য ইউক্রেনের পশ্চিমী মদতপুষ্ট সরকার তদ্বির শুরু করে।

উত্তেজনার আগুন বাড়তে থাকে। এক সতর্কবার্তায় পুতিন ঘোষণা করেন ইউক্রেনের বর্তমান প্রশাসনের এমন কার্যকলাপ চলতে থাকলে ইউক্রেন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। যদি সত্যিই এমন ঘটে, ইউক্রেন সরকারই এর জন্য দায়ী হবে। NATO অবশ্য ইউক্রেন সরকারের এই দাবি অগ্রাহ্য করেছে। যদি সত্যিই ইউক্রেনের আকাশকে NO FLY ZONE হিসাবে স্বীকার করা হয় তবে, তা সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার সামিল হবে, এবং এর ফলে শুধুমাত্র ইউরোপই নয়, সারা পৃথিবীর পক্ষেই এক মারাত্মক বিপর্যয়কর ঘটনা হতে পারে।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্টের অনুরোধে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মিত এবং বর্তমানে পোল্যান্ডে এবং বুলগেরিয়া মজুত যুদ্ধবিমান এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ইউক্রেনে পাঠানোর চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা গেল। পোল্যান্ড অবশ্য এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরোধিতাই করছে কারণ, এর ফলে যুদ্ধের আগুন আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাশিয়া ইউক্রেনের সংঘর্ষের পরিণতি কি হতে পারে তা, এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব। তবে আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজারে সঙ্কট যত বাড়ছে, নতুন করে তৈরি পশ্চিম দুনিয়ার সাথে রাশিয়ার ঠাণ্ডা যুদ্ধ গরম যুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না এবং তা হবে মানবেতিহাসের এক ভয়ঙ্করতম ট্র্যাজেডি যে ভবিষ্যতবাণী আমেরিকান প্রশাসনের প্রাক্তন আধিকারিকেরা ইতিমধ্যেই করেছেন।

সূত্র : FRONT LINE, March, 25, 2022

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-